রুকু সুকু

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

আলোকময় ঘোষ
প্রীতিভাজনেষু

রুকু সুকু

রুকু তার বাবার ইজি-চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে আধশোয়া হয়ে মৌজ করে বই পড়ছে। মেঝেতে, অল্প দূরে, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে সুকুর আদরের বেড়াল, শেলি। শুয়ে আছে নরম একটা আসনের ওপর। আর সুকু বসে আছে আর একটু দূরে, মেঝেতে, জানালার কাছে। বাবা তাকে ভীষণ একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন। সেই কাজেই সুকু ব্যস্ত। একটা ব্রাউন কাগজের ওপর নানা মাপের, বিভিন্ন আকারের টোব্যাকো পাইপ ছড়ানো। চকচকে একটা লোহার কাঁটা দিয়ে সুকু পাইপ পরিষ্কার করছে।

রুকু পড়াতেই তন্ময়। সাংঘাতিক বই। আফ্রিকার গা-ছমছম-করা গভীর অরণ্যে গোরিলা বেরোল বলে! রুকুর ডান-পা মাঝে মাঝে দুলছে। দুলতে-দুলতে একবার দুবার শেলির গায়ে লাগছে। এক

পেট মাছ ভাত খেয়ে শেলির নেশা হয়ে গেছে। ঘুমে একেবারে কাদা। রুকুর পা লাগলেও ঘুমের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। রুকু বুঝতে পারছে মাঝে মাঝেই তার ডান-পায়ের বুড়ে আঙুলটা নরমমতো কী একটায় ঠেকে ফিরে আসছে। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখার মতো অবস্থায় সে নেই। তাই যতবার পা ঠেকছে, ততবারই ডান হাতের একটা আঙুল কপালে ঠেকাচ্ছে। পায়ে কিছু ঠেকলেই নমো করতে হয়। পড়ায় যতই তন্ময় হয়ে থাক, অভ্যাসটা ভোলেনি।

সুকু অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছে। নাঃ, দাদাটা দেখছি শেলি-টাকে ঘুমোতে দেবে না,

"আমার বেড়ালটাকে বাব বার লাথি মারছিস

কেন দাদা ?”

“ও, বেড়াল। কোথায় বেড়াল ? কার বেড়াল ? লাথি মারব কেন ?” রুকু আফ্রিকার অরণ্য থেকে উত্তর দিল।

“তখন থেকে তুই লাথি মারছিস, আমি দেখছি, তবু বলবি লাথি মারব কেন ?”

“যতবার পা লাগছে ততবারই তো নমো

“তোকে নমোও করতে হবে না, লাথিও মারতে হবে না। ওর ঘুম ভেঙে যাবে। অতি কষ্টে একটু ঘুমিয়েছে।”

“পায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে বিছানায় শুতে বল না।”

“আহা। ওকে সরাতে গেলেই ঘুম চমকে যাবে না। হয় তুমি পা নাচানো বন্ধ করো, আর না হয় নিজে একটু পেছিয়ে যাও।

"ও, পেছিয়ে যাব ?" রুকু পা দিয়ে ইজিচেয়ারটাকে পেছন দিকে ঠেলতেই ঠেকন' কাঠটা পেছনের ঘাট থেকে সরে গেল। ফ্রেম-ট্রেম সবসুদ্ধ রুকু সশব্দে চেয়ারে তলিয়ে গেল। শেলি চমকে উঠে, ন্যাজ গুটিয়ে, ঘরের মেঝেতে থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে, পালাবার আগে ঘটনাটা কী ঘটে গেল বোঝার চেষ্টা করছে।

রুকু কিন্তু বুঝতে পারেনি যে, ইজিচেয়ার খুলে সে পেছন দিকে পড়ে গেছে। পড়ার আগে সে ছিল গাছের ডালে বাঁধা উঁচু একটা মাচার ওপর। গভীর রাত। ঝিম-ঝিম চাঁদের আলো। মাচার তলায় লেপার্ড এসে সবে কড়মড় করে হাড় চিবোতে শুরু করেছে। রুকু ভেবেছে, সে মাচা ভেঙে পড়ে গেছে। তারস্বরে পড়ে পড়েই চেঁচাচ্ছে "বাঘ, বাঘ, বাবা বাবা বাঘ।"

দাদাকে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতে দেখেই সুকু পাইপটাইপ ফেলে ছুটে এসেছিল। রুকু কী বই পড়ছিল সে জানে না। সে জানে কাঠের ফাঁদ থেকে দাদাকে উদ্ধার করতে হবে। বইটা ছিটকে মাথার দিকে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুকু দাদার হাত দুটো ধরতেই রুকু আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবা, বাবা বাঘ, ওরে বাবা বাঘ।"

সুকু ধমকে উঠল, "চোখ বুজিয়ে কী বাঘ বাঘ করছিস। চোখ খুলে ছাখ, বাঘ না সুকু।"

পাশের ঘরে বোনাটা রেখে মা রাজ্যেশ্বরী সবে একটু চোখ বুজিয়েছিলেন, তন্দ্রামতো আসছিল। হুড়মুড় শব্দটা শুনেছেন, তার-পরই বাঘ, বাঘ চিৎকার। প্রথমটায় তিনিও থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। দিন কি রাত, বুঝতেই একটু সময় লাগল। রাতের দিকে এই ডালটনগঞ্জে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। পাহাড়ের দিক থেকে নেমে আসে লোকালয়ে। বেশির ভাগই গুলবাঘ। বনবেড়াল তো হামেশাই উঠে আসে বাংলোর হাতায়।

বারান্দায় চেনে বাঁধা ছিল অ্যালবার্ট। মাংস-ভাত খেয়ে সেও একটু ঝিমোচ্ছিল। শব্দটব্দ শুনে সমানে ঘেউ ঘেউ করছে।

রাজ্যেশ্বরী যখন বুঝলেন সময়টা দুপুর, তখন তাঁর সাহস ফিরে এল। যত সাহসী বাঘই হোক, দুপুরবেলা কিছুতেই আসতে পারে না। তিনি দ্রুতপায়ে এ ঘরে এলেন। রুকু তখনও মেঝেতে স্ট্রেচারের

মতো পড়ে থাকা ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়ে আছে। সুকু হাত দুটো ধরে টানাটানি করছে। রুকুর মুখ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে বাঘ শব্দটা আর বেরোচ্ছে না। অস্পষ্ট বা, বা, বা।

"কী করেছিস দাদাকে ?"

"আমি কিছুই করিনি মা। নিজে থেকেই এইরকম হয়ে গেছে।"

"সে কী রে। সর সর। এই রুকু, রুকু, রুকু।"

"মা, তুমি এসেছ, এসেছ মা ?"

"হ্যাঁ এসেছি। এই তো তোর সামনে দাঁড়িয়ে। কী হয়েছে বলবি তো।"

রুকু মায়ের গলা শুনে পিট পিট করে তাকাল। না, আফ্রিকার জঙ্গল নয়, নিজেদেরই বাড়ি। রাত নয় দিন। সামনে বাঘ নয়, মা আর সুকু।

"আমাকে তুলে দাও মা।"

সুকু খেপে গেছে, "আমাকে তুলে দাও মা। তখন থেকে তোর হাত ধরে টানছি আর বলছি, দাদা একটু ওঠার চেষ্টা কর, তা না করে উনি চিতপটাং হয়ে চোখ বুজে বুজে দিনদুপুরে কেবল বাঘ-বাঘ করছেন।"

রুকু উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলে, "আমি মাচা ভেঙে পড়ে যাইনি মা ?"

"মাচা ? কিসের মাচা ?" ইজিচেয়ারটা টপকে রাজ্যেশ্বরী মেঝে থেকে বইটা তুলে নিলেন, "ও, তুই হান্টার সায়েবের শিকারকাহিনী পড়ছিলি। বাঃ, দুপুরবেলা নিজের পড়া গোল্লায় দিয়ে এইসব হচ্ছে।"

রুকু মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসে আছে। কোমরে আর ঘাড়ের কাছে ভীষণ লেগেছে। হাত দিয়ে কোমরের কাছটা চেপে ধরে বললে, "না, মা, খাওয়াদাওয়ার পর জাস্ট একটু পাতা ওলটাচ্ছিলুম। তারপর যা হয়, আর একটু, আর একটু করতে করতে একেবারে ঘোর

অরণ্যে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সাধ্য কার। তুমিও বেরোতে পারতে না মা।"

"চেয়ার খুলে পড়লি কী করে? দেখে বসবি তো।"

"দেখেই তো বসেছিলুম, ওই যে স্বকুর বেড়াল।"

বেড়ালটা ইতিমধ্যে সোফায় উঠে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই জিভ দিয়ে চেটে চেটে ন্যাজ পরিষ্কার করছে। বেড়ালটা ভারী সুন্দর দেখতে। ধবধবে সাদা। বড়-বড় লোম। মিষ্টি মুখ। মোটা চামরের মতো ন্যাজ।

"তুই বেড়ালটাকে বাঘ ভাবলি। কী সাহসী ছেলে রে।"

"না না বাঘ ভাবব কেন।"

"খুব হয়েছে, তুই এখন ওঠ।"

"কী করে উঠব মা, কোমর ভেঙে গেছে।"

"সে কী রে। কোমর ভেঙে গেছে কী রে।"

স্বকু বললে, "ওর কথা শুনো না তো মা। কোমর ভেঙে গেছে না হাতি। সত্তর বছরের আগে তুমি কারুর কোমর ভাঙতে দেখেছ?"

রুকু বললে, "আ হা, সে-ভাঙা আর এ-ভাঙা এক হল?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দু জনে এখন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই করতে হবে না। তোর কোমর ভাঙেনি বাবা। ভাঙলে আর ওই ভাবে বসে থাকতে পারতিস না। তবে হ্যাঁ, কোমরে লাগতে পারে। নে, ওঠ।"

রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে হাত ধরে মেঝে থেকে উঠতে সাহায্য করলেন। রুকু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটা সোফায় গিয়ে বসল।

"দেখি তোর বাবার ইজিচেয়ারটার কী হাল হল।"

চেয়ারের পেছন দিকের প্রপটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে।

"দেখ, কী অবস্থা করেছিস। আর কোনোদিন ইজিচেয়ারে বসে তোরা শিকারের গল্প কি ভূতের গল্প পড়বি না। মেঝেতে কার্পেটের

ওপর বসে-বসে পড়বি।"

রুকু বললে, "হঠাৎ খুলে গেল মা। সুকুর জন্যেই হল। ওর আদরের বেড়ালের গায়ে একটু পা লেগেছে কি লাগেনি, আমাকে বললে, তুই সরে বোস দাদা। যেই না সরতে গেলুম চেয়ারটা খুলে গেল।"

সুকু বললে, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, ও যা ভেঙেছে বাবা আসার আগেই আমি মেরামত করে রেখে দোব। তুমি বরং দাদার কোমরে যা হোক একটা কিছু করে দাও।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "তুই মেরামত করবি? তবেই হয়েছে। যা আছে তাও যাবে, কিংবা মানুষটা বিশ্বাস করে বসতে গিয়ে আবার ভেঙে পড়ে যাবে। এটা বরং একপাশে মোড়া থাক, কাল মিস্ত্রি এসে যা হয় করবে।"

"তুমি জান না মা আমি খুব বড় মেকানিক হব। তা না হলে বাবা এত দামি-দামি পাইপ আমাকে পরিষ্কার করার ভার দিয়ে যান? মনে নেই, তোমার সেলাই-কলটা আমি কী রকম করে দিয়েছিলুম?"

"খুব মনে আছে বাবা। তারপর তো সে-কলে সেলাই হল না।"

"সে তোমার দোষ মা। তোমাকে আমি বলেছিলাম মা প্রথম চালানোটা একটু আস্তে চালিও। তুমি শুনলে না। বসেই ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে চালালে, আবার ড্যামেজ হয়ে গেল।"

"তা হবে বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ। চল রুকু, তোর কোমরের সেবা করি।"

রুকুর কোমরের একটা জায়গা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ঘাড়ের দিকটা ছড়ে গেছে। রাজ্যেশ্বরী ওষুধ লাগাতে লাগাতে বললেন, "নাও এবার দ হয়ে বিছানায় কিছুদিন পড়ে থাকো। যেমন কর্ম তেমন ফল।"

ম্যাও করে একটা বেড়াল ডাকল। শেলি ঘরে এসেছে রুকুকে দেখতে বোধহয়। লাফিয়ে খাটে উঠল। রাজ্যেশ্বরীর গায়ে গা ঘষতে ঘষতে ঘোতর-ঘাঁতর শব্দ করছে। কোলের পাশে শোবার ইচ্ছে।

রুকু বললে, "তোর জন্যেই আমার এই অবস্থা হল।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "দাঁড়া, এই তো সবে শুরু। এইবার একদিন অ্যালবার্টের পাল্লায় পড়বে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। আমি তখনই বলেছিলুম, সুকু বেড়াল এনো না, আমি কুকুরটাকে কতদিন সামলে সামলে রাখব। না শুনলেন তোমার বাবা, না শুনল সুকু। দুজনেই ধেই-ধেই করে নেচে উঠলেন।"

"সুকু বলেছে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যাবে।"

"সুকুর আর বলতে কী। পাগলে কী না বলে।"

"তোমার কী মনে হয় মা!"

"মনে হয় খুব শিগ্‌গির একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।"

"না মা, তুমি শেলিটাকে বাঁচাও। কী সুন্দর দেখতে বল তো!"

"হ্যাঁ, দেখতে সুন্দর, তবে একটু হ্যাংলা। চুরির স্বভাবও মন্দ নয়।"

"সুকু বলেছে, ট্রেনিং দিয়ে ঠিক করে দেবে। ও বলছিল, বড় হয়ে একটা সার্কাসের দল করবে, আমাকে করবে ম্যানেজার, আর নিজে দেখাবে বাঘের খেলা।"

"বড় হবার দরকার কী, এখনই তো সার্কাস দেখাচ্ছে। এরপর তোর বাবা একটা বাঘ এনে না হাজির করেন! দু'জনেই তো সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।"

"জানো মা এবার পুজোর সময় আমাদের এখানে সার্কাস আসবে!"

"যাঃ এখানে ক'টাই বা লোক! সার্কাসের খরচ জানিস। ক' টাকাই বা টিকিট বেচে উঠবে।"

"না মা, সত্যি-সত্যি আসবে। জায়গাটায়গা সব ঠিক হয়ে গেছে ?"

"যাক, তাহলে পুজোটা এবার ভালই কাটবে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার সার্কাস দেখেছিলুম।"

"তবু তো তুমি মা একবার দেখেছ, আমরা যে জীবনে একবারও দেখিনি !"

"তোদের জীবন তো সবে শুরু হল, আমাদের তো শেষ হয়ে এল রে পাগল ! তোরা কত কী দেখবি ! কত দেশ দেখবি, ম্যাজিক দেখবি, সার্কাস দেখবি, কত ভাল ভাল মানুষ দেখবি !"

রুকু বললে, "তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তুমি কথায় কথায় আজকাল বড্ড চলে যাবার কথা বলো। তোমার সঙ্গে আড়ি।"

॥ ২ ॥

একই ঘরে দুটো খাট। একটা রুকুর, একটা সুকুর। সমান মাপ, সমান বিছানা। কারুর কিছু বলার নেই। দুজনেরই তিন দিকে জানালা। রুকুর কোমরটা খুব টাটিয়েছে। সন্ধে থেকেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া চলছে। ইতিহাস, ভূগোল, লাইফ সায়ান্স, ইংরেজি বাংলা। অঙ্কটাই কেবল হল না। শুয়ে শুয়ে অঙ্ক কষা যায় না।

সুকু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল, "চল্ দাদা চল্, তোকে ধরে ধরে খাবার টেবিলে নিয়ে যাই।"

সুকুর ওপর আর রুকুর রাগ নেই। অনেকক্ষণ রাগ পড়ে গেছে। বিছানা থেকে শরীরটাকে একটু তোলবার চেষ্টা করল রুকু। কোমরের কাছ থেকে শরীরটা কিছুতেই বাঁকছে না।

"উঠতে পারছি না রে সুকু!"

"সে কী রে!"

"হ্যাঁ রে, বাঁকাতে পারছি না কিছুতেই।"

"কী মুশ্‌কিল বল তো। ওই পাজি বেড়ালটার জন্যেই এইরকম হল। যাই, মাকে ডেকে আনি। তোকে কোলে করে নিয়ে যাবে।"

"কোলে করে কোথায় নিয়ে যাবে?"

"কেন খাবার টেবিলে!"

"খাবার টেবিলে নিয়ে গেলে আমি তো চেয়ারে বসতে পারব না রে, ওই টেবিলেই শুইয়ে দিতে হবে।"

"তাহলে কী হবে?"

"আমাকে আজ শুয়ে-শুয়েই খেতে হবে।"

সুকু খাবার ঘরে ফিরে এল। টেবিলে বাবা এসে বসেছেন। চোখে মোটা চশমা, হাতে একটা বিলিতি ম্যাগাজিন। একে-একে খাবারের পাত্র টেবিলে এসে জমছে। সরু চালের গরম ভাত, ছোট ছোট ফুলকো রুটি, স্যালাড, মাংসের কারি, ডাল, তরকারি। মা এঘর-ওঘর করছেন। বেড়ালটা একটা চেয়ারে বসে আয়েস করে গা চাটছে।

সুকু মৃদু গলায় ডাকল, "বাবা।"

"ইয়েস।"

"তোমার কাছে কোমর ভাঙার কোনও ওষুধ নেই?"

"ওষুধ খেয়ে কোমর ভাঙতে হবে কেন? একটু চেষ্টা করলে কোমর তো আপনিই ভেঙে যাবে!"

"না না, সে-ভাঙা নয়। দাঁড়াও আমি ভাল করে বুঝিয়ে বলি। ধরো কেউ শুয়ে আছে, এখন উঠে বসতে হলে কোমরের কাছ থেকে শরীরটাকে ভেঙে তুলতে হবে তো!"

"হ্যাঁ, তুলতে হবে।"

"এখন সে যদি তুলতে না পারে তাহলে কী হবে?"

"শুয়ে থাকবে।"

"কতদিন শুয়ে থাকবে?"

"যতদিন সে উঠতে না পারবে।"

"তোমার কাছে এমন কোনও ওষুধ নেই, যা খেলে মানুষ উঠে বসতে পারে?"

"কাকে ওঠাবার দরকার হল তোমার?"

"দাদকে।"

"দাদাকে! কেন, দাদা উঠতে পারছে না?"

"না তো? দাদা বলছে কোমর বাঁকছে না।"

"সেই গল্পটা তোমার মনে আছে, গাধা আর মূলো? গাধাটা

কিছুতেই নড়তে চাইত না, তখন গাধার মালিকের মাথায় একটা প্ল্যান এল। সে করলে কী? একটা লাঠির ডগায় একটা মুলো বেঁধে গাধাটার মুখ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চোখের সামনে ঝুলিয়ে দিল। গাধাটা মুলোটা ধরার লোভে গুটিগুটি এগোতে শুরু করল। গাধা এগোয়, মুলোও এগোয়। মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ পড়ছে তো। কিন্তু দাদা আর গাধা তো এক নয়!"

"না, তা নয়, তবে তুমি মুলোর বদলে একটা ফিশ ফ্রাই নিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারো। ফ্রাইটা দাদার নাকের কাছে ধরে, ধীরে-ধীরে পেছোতে থাকো, দেখ না দাদা সোজা হয়ে বসে কি না। যদি না বসে তাহলে সত্যি-সত্যিই ওষুধ দিতে হবে।"

রাজ্যেশ্বরী ঘরে আসছিলেন, "জিজ্ঞেস করলেন, কাকে ওষুধ দিতে হবে?"

সুকু বললে, "দাদা উঠে বসতে পারছে না। বললে শুয়ে-শুয়ে খেতে হবে।"

"আহা উঠবে কী করে, তুই-ই তো দায়ী।"

"তুমি একবার চলো না মা!"

ডক্টর মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন, "চল দেখি। আমি ওঠাতে পারি কিনা দেখি!"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "তুমি বোসো, আমি দেখছি।"

ডক্টর মুখার্জি সুকুকে বললেন, "কী, একটা ফিশ ফ্রাই নোব নাকি!"

রাজ্যেশ্বরী অবাক। "ফিশ ফ্রাই! ফিশ ফ্রাই কী করবে?"

সুকুই জবাব দিলে, "জানো মা, বাবা বলছিল, দাদার নাকের কাছে একটা ফিশ ফ্রাই ধরে আস্তে, আস্তে সরাতে থাকলেই দাদা উঠে বসবে।"

"সে আবার কী?"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "তোমার রান্নার হাত তো দারুণ। যা-ই রাঁধো, তার গন্ধে পঙ্গুও লোভে-লোভে গিরি লঙ্ঘন করে চলে আসবে।"

"তোমার ডাক্তারির হাত আর আমার রান্নার হাত।"

"মণিকাঞ্চন যোগ!"

সুকু বললে, "জানো মা, বাবা সেই গাধা আর মুলোর গল্প বলেছিল। মুলো দেখিয়ে গাধা চালাবার মতো ফিশ ফ্রাই দেখিয়ে দাদাকে ওঠাবার মতলব।"

ডক্টর মুখার্জি হো-হো করে হেসে বললেন, "দাদা আর গাধায় খুব একটা তফাত আছে কি? থাকলে কেউ বসে বসে ইজিচেয়ার চালায়?"

রুকু সেইভাবেই চিত হয়ে শুয়ে আছে, কপালে হাত রেখে। ঘরে কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বিছানার চারপাশে বই ছড়ানো। রুকুর বাবা ঘরে ঢুকে বললেন, "কী রে, কোমর বেঁকছে না?"

বাবার গলা পেয়েই রুকু ধড়মড় করে উঠে বসল। দাদাকে উঠে বসতে দেখে সুকু অবাক হয়ে গেল, "কী রে দাদা, তুই না তখন বললি, আমার কোমর ভাঙছে না রে সুকু, মাকে ডেকে আন।"

রুকুর মুখ দেখলে মনে হবে সেও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। রুকু বললে, "বাবার গলা শুনেই উঠে বসতে ইচ্ছে হল, আর তখনই ব্যথা ভুলে উঠে বসলুম। কী আশ্চর্য দেখ!"

"আশ্চর্যের কী আছে? কীরকম ডাক্তার একবার দেখতে হবে তো! রুগির ঘরে ঢুকলেই রোগ ভয়ে পালায়। আবার শুচ্ছ কি! চলো, খাবে তো!"

"আমি কি উঠতে পারব বাবা?"

"খুব পারবে! তুমি তো স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো রাস্তাতে

রাজ্যেশ্বরী পাত্রটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "না, না। এটা তো অ্যালবার্টের জমিদারি। ত্রিসীমানায় কারুর আসার উপায় নেই। এখন ডাকছে আমাদের কাছে আসার জন্যে। এবার একবার ছেড়ে দিই। সুকু, তুমি শেলিকে তোমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখো।"

"বাবা যা বললে এখন একবার করে দেখলে হয়!"

"না রে! রাতের বেলা আর এক্সপেরিমেন্ট করে দরকার নেই। সকালবেলা চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

নানারকমের বাদ্যযন্ত্রের সুর কানে ভেসে এল। পাহাড়ের দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়ার ওঠাপড়ায় সেই সুর কখনও জোর হচ্ছে, কখনও কমে যাচ্ছে। সকলেই অবাক। এত রাতে কোথায় আবার গান-বাজনা শুরু হল। সুকু তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল। দূরে পাহাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁচু পথ। সেই পথে চলেছে এক সার টিপ-টিপ আলো। সেগুন গাছের মাথার ওপর থেকে একটা রাতপাখি ডেকে উঠল, হুট-হুট। সুকুকে দেখে অ্যালবার্ট গা ঝাড়া দিয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

॥ ৩ ॥

রাত তখন কটা হবে বলা শক্ত, তবে চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে, একটু পরেই নেমে যাবে থাক থাক পাহাড়ের কোলে। রুকুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের কোণে খাটের পায়ের দিকে একটা খস-খস উসখুস শব্দ হচ্ছে। সুকুর বিছানা শূন্য। পাতলা মশারির ওপাশে পুবের জানালা। পুব আকাশে সুরু-সুরু আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। সেই আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বালিশ, অল্প অল্প কোঁচকানো চাদর, পায়ের দিকে জড়ো করে রাখা একটা চাদর, তার ওপর মহা আরামে ঘুমোচ্ছে সুকুর বেড়াল।

বালিশ থেকে মাথাটা অল্প একটু তুলে পায়ের দিকে তাকাতেই খসখস শব্দের কারণটা বোঝা গেল। মেঝেতে সুকু বসে আছে সোজা হয়ে। সামনে একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু। কখনও বড় হচ্ছে, কখনও ছোট। ধূপ। শেষ রাতে এমন দৃশ্য রুকু কখনও দেখেনি। ধূপ জ্বেলে ধ্যানে বসেছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি! পরনে হাফ প্যাণ্ট। এদিকে শেষ রাতের হাওয়ায় বেশ শীত-শীত করে। একটিমাত্র পাখি ঘুম ভেঙে একবার দুবার ডাকতে চেষ্টা করছে। ভাল পারছে না। চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে মনে হয়।

হঠাৎ আর এক ধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল। ফোঁ ফোঁস। সুকুর পেছন দিকটা সোজা, ঘাড়, মাথা মেরুদণ্ড এক সরল রেখায় মেঝের ওপর খাড়া। নিশ্বাসের শব্দ। নেবার সময় বুকটা চিতিয়ে উঠছে, ছাড়ার সময় নেমে যাচ্ছে। এইভাবে শ্বাস নেওয়া আর

ছাড়াকে বলে প্রাণায়াম। সুকু শেষ রাতে ধ্যান আর প্রাণায়াম শুরু করেছে। রোজই করে, না আজ থেকেই শুরু হল। সুকুর ব্যাপার! মাথায় কখন কী ঢুকছে! কোথা দিয়ে কী বেরোচ্ছে! মা ঠিকই বলেন, মাঝে মাঝে ছেলেটার শিং বেরোয়।

রুকু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কোনও শব্দ করছে না। শব্দ করলেই সুকু হয়তো সতর্ক হয়ে যাবে। হঠাৎ বাঁ হাতটা রেডিওর এরিয়েলের মতো সোজা ওপর দিকে উঠে গেল। সেই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ রইল। ছেলেবেলায় বর্ণ পরিচয়ের বইতে "ঋ"র খোপে এই রকম হাত-উঁচু ঋষির ছবি থাকত, তলায় লেখা, ঋষি মশাই বসেন পূজায়। সুকুকে দেখাচ্ছে, ঠিক যেন খুদে ঋষি।

সুকু প্রায় মিনিট পনেরো ওইভাবে হাত উঁচু করে বসে রইল। ধীরে ধীরে হাত নেমে এল। এইবার কী করবে? প্রণাম করছে। সুকুর ভগবান কে? মা কালী, দুর্গা, শিব, মহাবীর? কে জানে কে! সুকু উঠে পড়ল। মাথার বালিশের তোয়ালে-ঢাকাটা হয়েছিল সুকুর বসার আসন। মশারি তুলে চাপাটা বালিশে রেখে দিল। বেড়ালটার কপালে আঙুল ঠেকাল। যেন টিপ পরাচ্ছে। ঠোঁট নড়ছে বিড় বিড় করে। মন্ত্র কিংবা কোনও প্রার্থনা চলছে মনে মনে।

সুকু এইবার রুকুর বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। রুকু শরীরটাকে আলগা করে শুয়ে রইল। ধরে না ফেলে জেগে আছে। মশারি তুলে রুকুর কপালে হাত ঠেকাল। হাতটা কিছুক্ষণ রইল। রুকুর হাসি পাচ্ছিল। শর্টস পরা বাবাজি। হাতটা উঠিয়ে নিজের কপালে ঠেকাল। মশারিটা সাবধানে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথার ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল।

বাগানের গাছে সেই পাখি দুটো এসেছে। ভোরের পাখি। রোজ ঠিক এই সময়ে আসে। পুব আকাশে সরু সোনালি সুতোর মতো আলোর রেখা দেখা দিলেই উড়ে চলে যায়। অদ্ভুত দুটো

পাখি। এ গাছে একটা, ও গাছে একটা। এ শিস দিয়ে বিশাল বড় একটা সেনটেন্স তৈরি করে যেই চুপ করল, সঙ্গে-সঙ্গে ও পাখিটা তার জবাব দিল। আবার এ ধরল, ও চুপ করে রইল। দুজনে কত কথাই যে বলে! গান না প্রার্থনা বোঝা শক্ত। বেশ বোঝা যায় দুজনে কথা বলছে। পাখির ভাষা রুকুর জানা নেই। ভোরের আকাশ সুরে সুরে ভরে যায়। কী পাখি আসে দেখতেই হবে। অদ্ভুত অসাধারণ কোনও ধার্মিক পাখি। ডালটনগঞ্জে এই প্রথম এসেছে।

রুকু উঠে পড়ল। পুবের জানালাটা সুকুর বিছানার দিকে। রুকুর কোমরের ব্যথাটা অনেক কমে গেছে। নেই বললেই হয়। বাবার ওষুধ আর হাতের কী গুণ! কেমন চট করে সেরে গেল। মেঝেতে দাঁড়িয়ে মা মা বলে রুকু বার কতক নেচে নিল। আমার মা, আমার বাবা। শুধু আমার কেন! আমাদের মা আমাদের বাবা।

পুবের জানালা ধরে রুকু দাঁড়িয়েছে। আকাশের গায়ে নতুন দিন। সূর্য, সূর্য আসছেন সাত ঘোড়ার লাল রথে চেপে। একদিন যদি দেখতে পেতুম তোমাকে। সুকু মাঝে-মাঝে আকাশে আশ্চর্য, আশ্চর্য জিনিস দেখতে পায়। গত বছর বর্ষার এক দুপুরে সুকু আকাশে টর্পেডোর মতো পর পর সাতটা উজ্জ্বল জিনিস যেতে দেখেছিল। মা কিছুতেই বিশ্বাস করেননি। বাবা বলেছিলেন অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমরা কজনই বা আকাশের দিকে ভাল করে তাকাই। রাত্তির বেলাটা তো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দি। সুকু দেখতে পায় রুকু কেন পায় না! সুকুর ওপর ভীষণ হিংসে হয়।

নাঃ, পাখি দুটোকে কিছুতেই দেখা যায় না। কোথায় যে বসে আছে! শিস শুনতে পাচ্ছে পাখি দেখতে পাচ্ছে না। একটা তিতির তীক্ষ্ণ সুরে ডাকতে ডাকতে পাহাড়ের দিকে উড়ে গেল। সুকু এখন বাগানে, সঙ্গে অ্যালবার্ট। ও! সুকুর হাতে একটা বল। দুজনে খুব
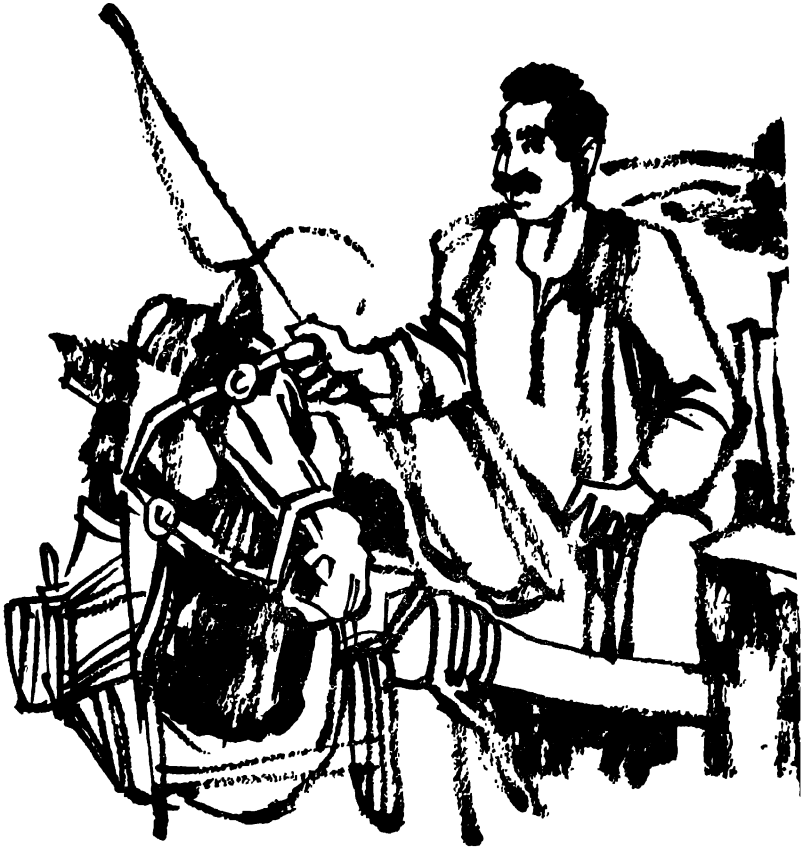
খেলা হচ্ছে। অ্যালবার্টটা পাঁই পাঁই করে ছুটছে। কী খেলতেই যে পারে! খেলার সময় মুখটা কেমন দুষ্টু দুষ্টু দেখায়! মাঝে মাঝে দুজনেই ঘাসের ওপর খুব খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিচ্ছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে অ্যালবার্ট স্নুকুকে ধমকাচ্ছে। সেগুন গাছ থেকে একটা দুটো বড় পাতা ঝরে পড়ছে। শীত আসার খুব একটা দেরি নেই।

ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে ঘণ্টার টিং টিং শব্দ।

একটা টাঙা আসছে। এদিকে বড় একটা আসে না। তাও এত সকালে। কে আসছে। রুকুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে গাড়িটা থামল। অ্যালবার্ট গেটের দিকে তাকিয়ে খুব ঘেউ ঘেউ করছে। সুকু দৌড়েছে, কে এল দেখতে।

রুকু ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। মোরাম-ঢালা একটা পথ সোজা গেটের দিকে চলে গেছে। লোহার বড় গেটের বাইরে টাঙা দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াটা ল্যাজ নাড়ছে। চোখে দস্যু সর্দারের মতো ঠুলি আঁটা। বসে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। পায়ের কাছে বড় স্যুটকেস। টাঙাঅলা বলছে, "হাঁ, এহি তো মুখার্জি সাহাবকা কোঠি হায়। ডাক্তার সাহাবকা।"

সুকু গেটের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। গেটের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে অ্যালব্যার্ট পটাক-পটাক করে ল্যাজ নাড়ছে। বৃদ্ধ সুকুকে জিজ্ঞেস করছেন, "দাদু, এই বাড়িতেই কি রাজ্যেশ্বরী থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বরী তো আমার মা।"

"আমি কে বলো তো?" টাঙা থেকে নামতে-নামতে বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্ন করলেন। সাদা প্যান্ট, সাদা বুশ শার্ট, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সুকু অবাক, অ্যালবার্টও অবাক।

রুকু ভেতরে চলে এল। মাকে খবর দিতে হবে তো! মা উঠে পড়েছেন। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করছেন দু'হাত তুলে। বাবা এখনও ওঠেননি। অন্যদিন ভোরেই ওঠেন, কাল বোধ-হয় অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। কিংবা টেলিস্কোপ। বাবার একটা টেলিস্কোপ আছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রুকু বললে, "মা কী সুন্দর এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখবে চলো। এই লম্বা নাক, চোখে চশমা, সাদা চুল সাদা জামাকাপড়।

তুমি কখনও তাঁকে দেখনি।"

রাজ্যেশ্বরী বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। টাঙাঅলা স্যুটকেসটা নামাচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ মানুষটি। সুকু বলছে "আপনি ভেতরে আসুন না, এই তো আমি কুকুরের গলায় বেল্টটা ধরে আছি। ও কিছু করবে না। একটু খালি চেটে দেবে।"

"ও বুঝি চাটলেই বুঝতে পারে শত্রু কি মিত্র।"

রাজ্যেশ্বরী প্রায় ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন, "বাবা, তুমি?"

"হ্যারে আমি। কোনও খবরটবর না দিয়েই চলে এলুম। খুব অবাক হয়েছিস।"

"অবাক হব না, তুমি এই প্রথম এলে। কতবার আসব-আসব করেছ, আসনি।"

"এবার আমার শরীর আমাকে টেনে এনেছে।"

"শরীর! শরীর খারাপ নাকি!"

টাঙাঅলা হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করল, "নমস্তে ডাগদার সাব।"

বাবাও এসে গেছেন। টাঙাঅলাকে বললেন, "নমস্তে, ভাল আছিস।"

"হাঁ জি।"

"যা স্যুটকেসটা ভেতরে নিয়ে যা। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।" নিচু হয়ে প্রণাম করলেন। রাজ্যেশ্বরীর খেয়াল হয়নি; তিনিও প্রণাম করলেন। রুকুকে বলতে হল না। সুকু বাঁ হাতে অ্যালবার্টের গলার বেল্ট ধরে আছে। সেই অবস্থাতেই ডান হাত বাড়িয়ে দাদুর পা ছুঁতে গিয়ে কেতরে মোরামের ওপর পড়ে গেল। অ্যালবার্টের ঘাড়ের ওপর সুকু। কুকুরের কেঁউ-কেঁউ আর্তনাদ। সুকু শুয়ে শুয়েই বলছে, "দাদু, প্রণাম।"

"হ্যাঁ দাদু। এমন প্রণাম আমি জীবনে দেখিনি।"

রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে ওঠাতে-ওঠাতে বললেন, "কুকুরটাকে ছেড়ে দে না। তোর কি সবই অদ্ভুত রে।"

"যদি কামড়ে দেয় মা?"

"কামড়াবে কেন?"

ডক্টর মুখার্জি দাদুকে নিয়ে বারান্দার দিকে এগোতে-এগোতে বললেন, "তুমি টাঙাভাড়াটা দিয়ে দাও।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"সে কী, আপনি দিলেন কেন?"

"বাঃ, আমি দোব না তো কে দেবে?"

রাজ্যেশ্বরী এগিয়ে গেছেন। রুকু আর সুকু পেছন পেছন আসছে।

রুকু বললে, "কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।" হঠাৎ সুকুর কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কী রে। রক্ত।"

"ও কিছু না। উলটে পড়ে গেলুম কিনা।"

"তুই পড়ে গেলি কেন?"

"ওই যে অ্যালবার্ট হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিলে। আমার ভীষণ অপমান হয়েছে।"

"অপমান? কে অপমান করলে।"

"নিজেকেই নিজে অপমান করেছি। প্রণাম করতে গিয়ে পড়ে গেলে কী হয়। অপমান হয় না! আমি আর কথা বলব না।"

"কার সঙ্গে কথা বলবি না।"

"অ্যালবার্টের সঙ্গে।"

"বেশি কথা বলিসনি। এখন ওই জায়গাটায় ওষুধ লাগাবি চল।"

"আমি ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দোব।"

"কেন, ওষুধ লাগলে কী হয়।"

"সে তুই বুঝবি না। আমি যেখানে যাব সেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, দোকান নেই, বাজার নেই, শহর নেই, শুধু পাহাড়, জঙ্গল ঝরনা।"

"কবে যাবি ?"

"তোকে বলব কেন ? তুই আবার মাকে বলে দিবি।"

"ও, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না। ঠিক আছে।"

রুকু হন হন করে সুকুকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। বাংলোবাড়ি যেমন হয়, চারপাশে ঢাকা বারান্দা। সামনের পথে যেমন ঢোকা যায় পেছনদিকের সুন্দর উঠোন দিয়ে রান্নাঘর, ভাঁড়ার, কলঘরের পাশ দিয়েও আসা যায়। রুকু সেই দিকেই চলে গেল। পেছনে একটা পিচ ফলের গাছ। সারা দুপুর ঠ্যাঙাঠেঙি করেও এখনও কয়েকটা পিচফল রয়েছে। রঙ ধরেছে। দু'একদিনের মধ্যেই তুলতুলে হবে। যত না খেতে ভালবাসে, তার চেয়ে দেখতে ভালবাসে রুকু। গ্রীষ্মের দুপুরে একটা পিচফল হাতে নিয়ে সেগুনের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকো। চারদিকে লু ছুটছে। আকাশের গায়ে তামাটে পাহাড়। একটা ভোমরা এলিয়ে পড়া ফুলের ইঞ্চিখানেক দূরে ভোঁ ভোঁ করছে। মাঝে মাঝে ছোঁ মেরে গর্ভকেশর থেকে পরাগ আর মধু তুলে আনছে। সেগুনের তলার ঝোপে এক ডাল থেকে আর-এক ডালে মাকড়শা ঝুলে ঝুলে জাল বুনে চলেছে। পিঁপড়ের সারি চলেছে পিঠে ডিমের বোঝা নিয়ে। এই টুকটুকু সোনালি মাছি মায়ের নাকের নাকছবির মতো ফিন ফিন করে উড়ছে।

॥ ৪ ॥

শেলি তীরবেগে ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এল। উঠোনের মাঝখানে পিঠটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। মোটা ন্যাজটা পায়ের ফাঁকে। যেদিক থেকে ছুটে এল সেইদিকেই তাকিয়ে আছে। কেউ যেন আসবে। পিচগাছ থেকে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল ডাকতে ডাকতে। ব্যাপারটা কী দেখার জন্য রুকু দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিভ বের করে হ্যা হ্যা করতে করতে ছুটে এল অ্যালবার্ট। উসকো-খুসকো চেহারা। বড় বড় লোম হাওয়ায় উড়ছে। এই রে, কেউ দেখেনি শেলির দফা এইবার রফা করে দেবে। রুকু আতঙ্কে চোখ বুজিয়ে ফেলেছে। চোখ বোজাতেই সে ফাদার ওবোর মুখ দেখতে পেল। কী আশ্চর্য! ফাদার যেন বলছেন, যেমন বলতেন,

রুকু প্রে টু গড, প্রে অ্যাণ্ড প্রে। হে ঈশ্বর, শেলিকে বাঁচিয়ে দাও, অ্যালবার্ট যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করে ফেলে। কতক্ষণ চোখ বুজিয়ে থাকা যায়। রুকু চোখ চেয়ে অবাক দৃশ্য দেখল। শেলি পিচগাছের তলায় চার পা উঁচু করে শুয়ে আছে, অ্যালবার্ট ফোঁস-ফোঁস করে শুঁকছে। রুকু আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ভাব হয়ে গেছে, ভাব হয়ে গেছে।"
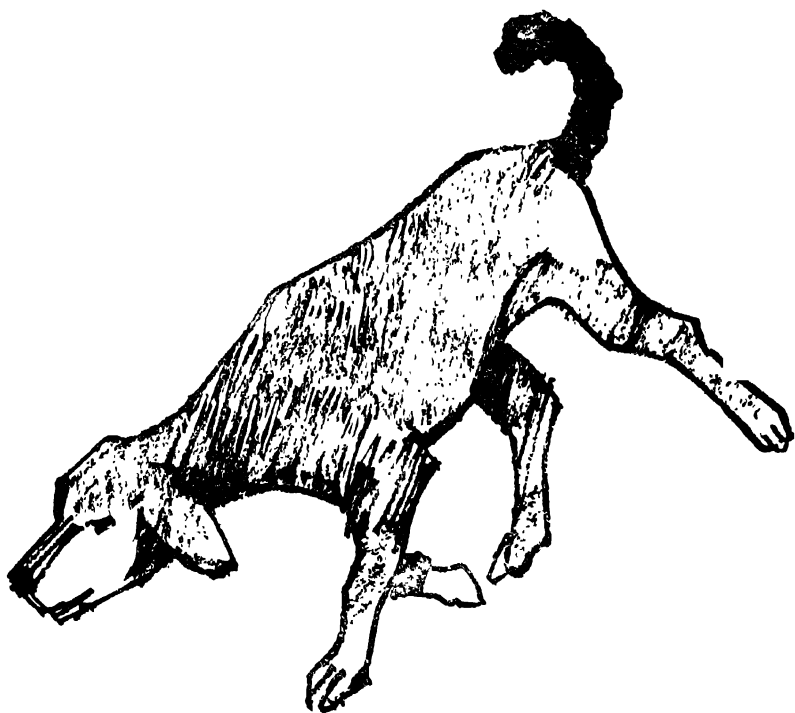
"কাদের ভাব হল দাদু?"

কাঁধে তোয়ালে, হাতে টুথব্রাশ, বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন দাদু। রুকুর সঙ্গে এখনও ভাব হয়নি। রুকু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মানুষটির দিকে। যেমন লম্বা, তেমনি সুন্দর গায়ের রঙ।

"বিগ মাস্টার, তুমি অবাক হয়ে কী দেখছ ?"

রুকুর ভীষণ লজ্জা করছে। অচেনা মানুষের সামনে রুকু একটু লাজুক হয়ে যায়। রুকু হাসি হাসি মুখে শেলি আর অ্যালবার্টকে দেখিয়ে বললে, "এই যে এরা।" শেলি অ্যালবার্টের ঘাড়ে চেপেছে। অ্যালবার্ট চিতপাত হয়ে পড়ে আছে।

"এতদিন বুঝি ঝগড়া চলেছিল।"

"না, তা নয়, অ্যালবার্টকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হত, শেলিকে ওর কাছে ভয়ে যেতে দেওয়া হত না।"

"বাঃ, বেশ নাম রেখেছ তো।"

সুকু হই-হই করে বেরিয়ে এসেছে। ধেই ধেই নাচ, "ওমা দেখবে এসো, দেখবে এসো, ভগবান আছেন, অবশ্যই আছেন, ভগবান আছেন, ভগবান আছেন।"

বাবা বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়, মুখে সাবান, হাতে দাড়ি কামাবার ব্রাশ। সুকুর চিৎকার আর নাচের ঠেলায় শেলি ন্যাজ খাড়া করে ঘরে পালাল, অ্যালবার্ট ছুটতে ছুটতে এসে, নতুন লোক দেখে খুব সাবধানে শুঁকে শুঁকে দেখতে লাগল।

দাদু বললেন, "ভাব, ভাব।"

মাও বেরিয়ে এসেছেন, "পাগলের মতো তুই নাচছিস কেন সুকু ?"

সুকু হাত পা নেড়ে বললে, "জানো মা, ভগবান আছেন, আমি প্রমাণ পেয়েছি। ওই দেখ অ্যালবার্ট, শেলি এখন ওর বন্ধু। প্রিয় বন্ধু। ভগবান আছেন।"

বাবা বললেন, "ওরে তোর নাচ থামা। ভগবান নেই তোকে কে বললে! সূর্যকে দেখবার জন্যে লণ্ঠনের দরকার হয় কি ? একটা সত্য জেনেই পাগলা হয়ে গেলি, এইরকম হাজারটা সত্য তুই ধীরে-ধীরে জানতে পারবি।"

মা দাদুকে তাড়া লাগালেন, "বাবা সেরে নিন। বেলা হয়ে গেল। চা তৈরি হয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ, যাই রে। তোর সংসার একেবারে জমজমাট। মনে হচ্ছে ভগবান যেন নিজে হাতে, নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। লিট্‌ল মাস্টার, ভগবান আছেন এবং তোমাদের মধ্যেই আছেন।"

সুকুর সঙ্গে রুকু কথা বলবে না। নাচ দেখে একটু-একটু হাসি পাচ্ছে। পাছে হেসে ফেলে তাই তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এল। যে যার নিজের বিছানা তুলবে, ঘর পরিষ্কার করবে, এই হল নিয়ম। রুকু অবাক হয়ে দেখল সুকু তার বিছানাটাও তুলে দিয়েছে। সব কটা জানালা খোলা। হু-হু করে হাওয়া আসছে। পাহাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে সূর্য। দূরে পাহাড়ের পথে গরুর পাল নিয়ে রাখাল চলেছে। ছোট-ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। দূরের জিনিস ছোট দেখায় কেন? জানতে হবে। মাকে এখন জিজ্ঞেস করা যাবে না। রান্নাঘরে ভীষণ ব্যস্ত। দুখিয়া দুধ দিতে এসেছে। শেলিটা খুব মিউ মিউ করছে দুধের লোভে। এক-একটা ডাক আবার ভীষণ আদরের —ঘোঁড়ড়। অ্যালবার্ট খুক খুক করে হ্যাংলা বেড়ালটাকে ধমক দিচ্ছে। অ্যালবার্ট হল রুকুর মতো, দুধটুধ তেমন পছন্দ করে না। কেবল মাংস, বিস্কুট, কেক।

মা ডাকছেন, "রুকু। রুকুউ।" খাবার ডাক। দশটায় স্কুল। দুপুরে দাদুর সঙ্গে গল্প হবে না, এখনও হবে না। সেই সন্ধেবেলা, না হয় রাতে খাবার পর।

মা বললেন, "সুকুকে ডাক না বাবা, কোথায় বসে আছে? বাগানে একবার ছাখ।"

সুকুকে সে ডাকতে পারবে না। সুকু তাকে অবিশ্বাস করে। মায়ের গুপ্তচর বলেছে। কোথায় যাবে বলছে না।

“সুকুকে কোথায় পাব মা ?”

“এই তো ছুখিয়ার সঙ্গে বকবক করছিল। বলছিল ঘোড়ার যখন ডিম হয়, গরুর কেন হবে না।”

“আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলব না মা, তুমি ছুখিয়াকেই বলো ডেকে দিতে।”

“কেন, তোর সঙ্গে আবার কী হল ?”

“ও আমাকে বিশ্বাস করে না, তোমার স্পাই বলেছে।”

রাজ্যেশ্বরী হো হো করে হেসে উঠলেন, “মায়ের স্পাই তো ভাল কথা রে। তুই তাতে রেগে যাচ্ছিস কেন ?”

রুকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে “না, মা ওর হাতের কনুইয়ের কাছটা সকালে গেটের কাছে পড়ে গিয়ে কেটে গেছে।”

“ওর কেটে গেছে তো তোর চোখে জল কেন ? ছুটো পাগল নিয়ে তো আমার মহা জ্বালা হয়েছে।”

“আমি বললুম, আয় সুকু, ওষুধ লাগিয়ে দি, ও বললে ওষুধ লাগাতে হবে না, আমি ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দেব, আমি যেখানে চলে যাব সেখানে কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না। জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় যাবে ? বললে, তোকে বলব না, তুই মাকে বলে দিবি। ও কোথায় চলে যাবে মা, আমাদের ছেড়ে।”

কথা শেষ করেই রুকু হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। রাজ্যেশ্বরী অবাক হয়ে রুকুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কী করবেন ভেবে পেলেন না।

“এই ছুখিয়া, ছুখিয়া।”

“যাই মা।”

“সুকু কোথায় আছে দেখ তো ? ধরে নিয়ে আয়।”

রুকুর কান্না শুনে দাছু বেরিয়ে এসেছেন, “কী হল রাজ্য, বিগ মাস্টারের চোখে জল কেন ?”

"আর বলবেন না বাবা, সকালেই এক ফ্যাসাদ, সুকু বলেছে সে নাকি কোথায় চলে যাবে, যেখানে চলে যাবে সেই জায়গার নামটা বড়বাবুকে বলেনি।"

"কার সঙ্গে যাবে ?"

"কার সঙ্গে যাবে আবার, ও তো কখনও সন্ন্যাসী, কখনও ভূপর্যটক, কখনও সৈনিক। কল্পনায় ও তো সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে।"

দাদু এইবার হেসে উঠলেন, "বুঝলি রাজ্য একেই বলে শিশুর জগৎ। লিটল মাস্টার এখন কোথায় ?"

"ওই তো দুখিয়াকে পাঠালুম ধরে আনবার জন্যে।"

সুকুর গলা পাওয়া গেল ছাদের ওপর থেকে। একতলা বাংলো। ছাদে ওঠার জন্যে সরু একটা লোহার সিঁড়ি আছে।

"আমাকে কোথায় পাবে মা, আমি যে ছাদে উঠে বসে আছি।"

তিনজনে ওপর দিকে তাকালেন। মাথায় কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। ফর্সা কপাল ঢেকে আছে। গায়ে একটা সাদার ওপর কালোডোরা শার্ট। জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখে। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

"তুই ওখানে উঠে কী করছিস সুকু! পড়ে গেলে কী হবে ?"

"পড়ব কেন ? আমি তো গাছ তুলছি।"

"গাছ তুলছিস মানে ?"

"ওপাশে যে জুঁই গাছটা হয়েছে, সেইটাকে দড়ি বেঁধে টেনে তুলছিলুম, গাছটা ফুরিয়ে গেল মা।"

"ফুরিয়ে গেল মানে ?"

"এই দেখ না শেকড় সুদ্ধু উঠে এসেছে। পুরো গাছটাই ওপরে চলে এসেছে। এই দেখ না।"

সরু সরু শিকড় সমেত লতানে গাছটা সুকু তুলে দেখাল।

"কী হবে মা, গাছটা পুঁতে দিলে বাঁচবে তো!"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "নাও, আর-এক সমস্যা তৈরি হল। বাবা, গাছটা বাঁচবে কি?"

দাছু বললেন, "বাঁচাতেই হবে। তুমি এক্ষুনি ওটাকে নিয়ে নেমে এসো। দুজনে চেষ্টা করে দেখি।"

ডকটর মুখার্জি বাইরে বেরিয়ে এলেন, "কী হল, আজ চা-টা হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। দুখিয়া, দুখিয়া।"

"যাই মা, ছোটবাবুর জুতো পড়ে আছে বাগানে, ছোটবাবু নেই মা।"

"ছোটবাবু মাচায় উঠে বসে আছে। আয়, চলে আয়, চা দিতে হবে ওপাশের বারান্দার টেবিলে।"

সংসার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সকালের চা পর্বে। অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশ বেলা হয়ে গেছে।

॥ ৫ ॥

দক্ষিণের আলোবাতাসওয়ালা সুন্দর একটা ঘর দাদুর জন্যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। মেঝেটা চকচকে লাল। বড় বড় জানালা। তিন দিকে ঢাকা বারান্দা। ঘরে একটা নেয়ারের খাট। খাটে পুরু গদি, ঝলমলে বেড কভার। একটা বর্মা কাঠের টেবিল। চেয়ার। একটা ইজিচেয়ার। টেবিলে একটা ঢাকা-দেওয়া বড় টেবিল-আলো।

দাদু সুধীরঞ্জন লাল মেঝেতে থেবড়ে বসে স্যুটকেস খুলছেন। রুকু আর সুকু উদ্‌গ্রীব হয়ে দু'পাশে বসে আছে। দাদু রুকুর নাম রেখেছেন 'ভালমানুষ'। সত্যিই সে ভালমানুষ, ধীর, স্থির। এক জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে। নিজের মনে, নিজের ভাবেই থাকে। ভাল বই পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সুকুর নাম রেখেছেন 'পালোয়ান'। ছটফটে পালোয়ান। সব সময় একটা-না-একটা কিছু তার মাথায় ঘুরছে। এক জায়গায় পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কাজ চাই, কাজ। সুকুর কাজ অনেক সময় বড়দের চোখে অকাজ। সুকুর ভয়ে সবাই তটস্থ। অনেকক্ষণ চোখের বাইরে গেলে, মা ভাবনায় পড়েন, "ওরে দেখ তো, সেটা আবার গেল কোথায়! কী করছে কে জানে।" কয়েকদিন হল মাথায় ঢুকেছে, বড় ইঁদারাটার ভেতর দিকে সার-সার যে লোহার আঙটাগুলো বসানো আছে, সেই আঙটা বেয়ে-বেয়ে ও নীচে নেমে দেখবে কোনও নতুন রাজ্যে যাওয়া যায় কি না, গুপ্তধনটন পাওয়া যায় কি না। তার এই অভিসন্ধির কথা রুকুকে বলেছিল। রুকু

কথায়-কথায় মাকে বলেছিল। মা তো ভেবে আকুল। ইঁদারার ধারে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা বসাতে পারলে ভাল হয়।

বাক্সর একটা দিকের তালাটা খোলা গেছে, আর-একটা দিকের তালা খোলা যাচ্ছে না, কীভাবে আটকে গেছে। বেড়ালটা ন্যাজটাকে লম্বা করে ওপর দিকে তুলে দিয়ে সুকুর পেছনে গা ঘষছে, আর মিউ-মিউ করছে। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছে সুকু। আর পারছে না।

"চাবিটা আমাকে দিন না দাদু, আমি এমন ঘোরাব এখুনি ঝ্যাট করে খুলে যাবে।"

"অত সহজ নয় দাদু, এ হল বিলিতি তালা, চেনির তৈরি। তুমি হয়তো ঠিকই খুলবে, পালোয়ান তো, তারপর আর লাগানো যাবে না।"

"চেনি কে দাদু!"

"নিশ্চয় কোনও সাহেব। নানা রকমের তালা তৈরিই তাঁর কাজ।"

"কবে তা হলে খুলবে দাদু।"

"ঘোরাতে-ঘোরাতেই খুলবে। অনেক জিনিস একসঙ্গে ঠেসে ডালা বন্ধ করেছি তো, বেকায়দা হয়ে গেছে।"

"আমি যদি আলিবাবার ডাকাত হতুম, চিচিং ফাঁক···"

খুট করে একটা শব্দ হল, দাদু বললেন, "খুলে গেছে, চিচিং ফাঁকের এখনও কত জোর দেখেছ! কতকালের মন্ত্র!"

সুকু ঝুঁকে পড়ে দেখল সত্যিই তালাটা খুলেছে কি না! হ্যাঁ খুলে গেছে। দাদু কিন্তু বাক্সর ডালাটা খুললেন না। হাসি-হাসি মুখে দুই নাতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কার কী চাই বলো।"

সুকু বললে, "আমার বাইনোকিউলার চাই।"

বাক্সর ডালাটা অল্প একটু ফাঁক করে দাদু ডান হাতটা
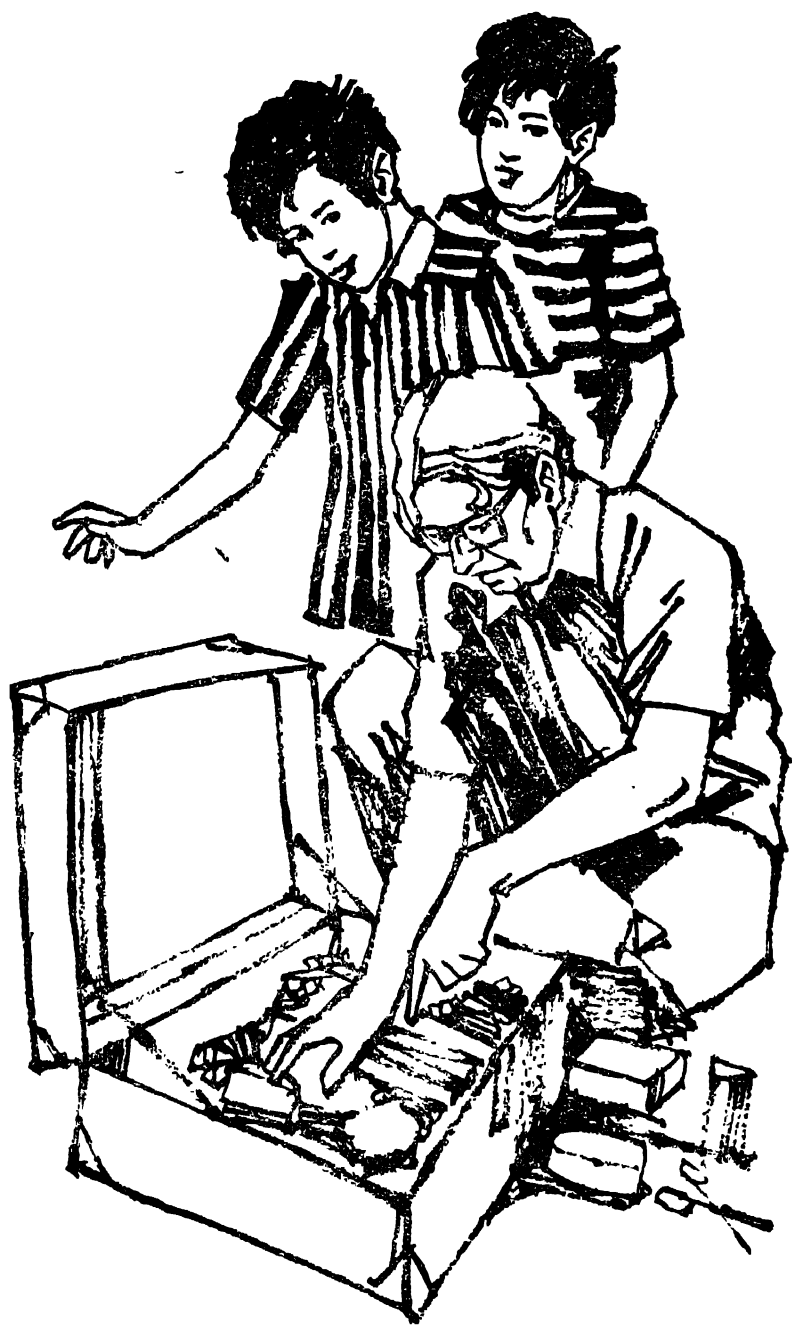
ঢোকালেন, সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এল সুকুর প্রার্থিত জিনিস, “এই নাও।” সুকু অবাক। “রুকু বলো।” রুকু একটু ইতস্তত করে বললে, “আমার একটা গগল্‌স চাই।” দাদু স্যুটকেসের ভেতর হাত ঢোকালেন, বেরিয়ে এল রুকুর জিনিস। রুকু, সুকু দু’জনেই অবাক। বেশ মজা তো!

সুকু বললে, “দাদু, আর যা চাইব তাই পাব?”

“বলা যায় না, পেতেও পারো।”

“তা হলে আমার শেলির গলায় বাঁধবার ছোট একটা ঘণ্টা চাই।”

দাদু মুচকি-মুচকি হাসলেন, “ভাবছ হেরে যাব? এই স্যুটকেস, ভেলভেটের ব্যাণ্ডে বাঁধা ছোট একটা ঘণ্টা দেখি। দেখিস পালোয়ানের কাছে হেরে না যাই।” হাত ঢোকালেন, বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা ঘণ্টা, নীল ভেলভেটের স্ট্র্যাপে বাঁধা। দু’ভাই হাঁ হয়ে গেছে।

“রুকু বলো, তোমার কী চাই!”

রুকু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললে, “একটা পেণ্ট-বক্স।”

“খুব সহজ, দাঁড়াও।” দাদুর হাত আবার স্যুটকেসের ডালার তলায়, বেরিয়ে এল একটা পেণ্ট-বক্স।

সুকু কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না, “দাদু, আমরা যা চাইছি কী করে আপনি দিচ্ছেন, আমার যে এখন একটা কাঁচি চাই।”

“কাঁচি! সে আর এমন বড় কথা কী! এই নাও কাঁচি।” স্যুটকেসের ভেতর থেকে একটা কাঁচি বেরিয়ে এল।

দাদু হাসছেন আর বলছেন, “বলো বলো আর কী চাই! আমি খেপে গেছি। যা চাইবে ঝপাঝপ দিয়ে দোব।”

রুকু বললে, “আমরা যে এইসব চাইব আপনি কী করে জানলেন?”

“তোমরা তো চাইছ না, আমিই চাইছি।”

“তার মানে?”

"আমার এই স্যুটকেসে যা আছে তোমরা তার বাইরে কিছুই চাইতে পারবে না।"

"কেন পারব না দাদু?"

"চেষ্টা করে ছাখো।"

সুকু বললে, "আচ্ছা, আমাকে একটা বেল্ট দিন তো, বেশ চওড়া, বকলসে সূর্য উঠছে।"

"একটা বেল্ট, সামান্য জিনিস।" হাত ঢুকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে একটা বেল্ট টেনে বার করলেন।

বেল্টটা হাতে নিয়ে সুকু অবাক হয়ে দেখলে, সে যেমনটি চায় ঠিক সেই রকম একটি বেল্ট। "হেরে গেছি দাদু।"

"হার-জিতের ব্যাপারই নয়, আমি যা চাই তাই আছে এখানে।"

রুকু বললে, "আমি যদি চকোলেট চাই!"

"পাবে।" স্যুটকেসের ভেতর থেকে একটা চকোলেট বেরিয়ে এল।

সুকু বললে, "আপনি ম্যাজিক জানেন।"

"না গো দাদু, ম্যাজিক নয়। আমি তোমাদের মনে ঢুকে বসে আছি। তোমরা চাইছ না, চাইছি আমি।"

"মনে ঢোকা যায় না কি, এ কি ঘরে ঢোকা!"

"এতক্ষণ দেখেও বিশ্বাস হল না?"

"আমাকে শিখিয়ে দেবেন দাদু?"

"শিখতে গেলে গুরু চাই, দাদু। আমাকে যে অনেক সাধনা করে শিখতে হয়েছে!"

"আপনার গুরু কে ছিলেন, দাদু?"

"আমার গুরু আর এ জগতে নেই! তা হলে শোনো।"

ছু'ভাই উৎকর্ণ হয়ে বসল। কোলের ওপর দাদুর দেওয়া জিনিস-পত্র। সামনে ডালাবন্ধ সেই মজার স্যুটকেস। বাইরে আকাশের

পাশে ইউক্যালিপটাস, দেবদারু গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ঝিম-মেরে-থাকা পাহাড়ের সারি। গোটা চারেক রঙিন প্রজাপতি জানালার বাইরে সাদা কাঞ্চনের ঝোপে ছটফট করে উড়ছে। একটা বেশ বড়সড়। সুকুর খুব ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে নিজেও একটু ওড়াউড়ি করে আসে। এদিকে দাদু গল্প শুরু করেছেন।

"আমার গুরু ছিলেন উবা, একজন বার্মিজ। তোমার মা তাঁকে জানত। তোমাদের বাবাও তাঁকে দেখেছেন। চেহারাটা ছিল অনেকটা হো চি মিনের মতো। ব্রহ্মদেশে মৌলমিন বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বিশাল একটা প্যাগোডায় তিনি থাকতেন।

গল্পে হঠাৎ বাধা পড়ল। ঘরে এলেন রাজ্যেশ্বরী। হাতে এক গেলাস গরম জল, "বাবা আপনি গরম জল চেয়ে এখানে থেবড়ে মজা করে বসে আছেন!"

মাকে হাতের কাছে পেয়ে সুকুর এতক্ষণের জমা বিস্ময় উথলে উঠল, "মা, ওমা, মা।"

"বলো, কী হয়েছে?" রাজ্যেশ্বরী ছেলের জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন সুকুকে এখন কথা বলতে দিলে রান্নাবান্না সব মাথায় উঠে যাবে। প্রশ্নে-প্রশ্নে পাগল করে দেবে। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বাঃ, এরই মধ্যে তো অনেক জিনিস বাগিয়ে বসে আছ!"

"হ্যাঁ মা, আমরা যা চাইব তাই পাব। কী মজার বাক্স দ্যাখো। কী করে হয় মা?"

"কী, কী করে হয়!"

"যা চাইছি তাই বেরিয়ে আসছে! দাদু, মাকে কিছু দিন।"

"তোমার মাকে চাইতে বলো।"

"মা তুমি কিছু দাও।"

"চাইব কী করে? আমি যে কখনও কিছু চাইনি। সবই যে না চাইতে পেয়েছি।"

অ্যালবার্ট এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। চিকুম চিকুম পায়ের নখের শব্দ তুলে দৌড়তে-দৌড়তে এল। জিভটা অল্প একটু বেরিয়ে আছে। সারা মুখে দুষ্টুমি। ঘরে ঢুকেই ফোঁস-ফোঁস করে স্যুটকেস শুঁকছে। ডালাটা একবার চেটেও দেখল। রাজ্যেশ্বরী বললেন, "এসে গেছে ভণ্ডুল করতে।"

"তোমাকে কী দেওয়া যাবে অ্যালবার্ট?" অ্যালবার্ট প্যাট-প্যাট করে ন্যাজ নেড়ে ভটভট করে বার কতক গা ঝাড়া দিল। সুকু বললে, "দাদু, ওকে একটা রবারের হাড় দিতে পারেন, চিবোবে। ওর নতুন দাঁত উঠেছে তো।"

"হ্যাঁ, দেওয়া যেতে পারে।" স্যুটকেসের ভেতর থেকে সত্যি-সত্যিই একটা রবারের হাড় বেরিয়ে এল। হাড়টা পেয়ে অ্যালবার্ট ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দাদু বললেন, "এইবার তা হলে বাক্সটা পুরো খোলা যাক, আর ম্যাজিক নয়। রাজ্য, তোর একটু সময় হবে, একবার আসবি এখানে?"

"হ্যাঁ আসব, তার আগে গরম জলটা খেয়ে নিন।"

"হ্যাঁ, গরম জল, দে।" দাদু হাত বাড়িয়ে জলের গেলাসটা নিলেন। রাজ্যেশ্বরী হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসলেন।

সুকু হেসে বললে, "অনেক দিন পরে মা নিলডাউন হয়েছে।"

সুধীরঞ্জন একটা শিশি থেকে গরম জলে দু'ফোঁটা ওষুধ ঢাললেন, তারপর জলটা চুমুকে চুমুকে খেতে-খেতে বললেন, "স্যুটকেসের ওপরের জিনিসপত্তরগুলো নামা তো রাজ্য।"

জামা, কাপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি, চাদর, কাগজে-মোড়া এক জোড়া স্লিপার। একে-একে সব জিনিস নামছে। দু'টো এয়ার গান, ছররার বাক্স। তিন চারটে পাইপ, তামাকের প্যাকেট। স্যুটকেস খালি। তলায় একটা ব্রাউন পেপার পাতা।

"কাগজটা তোল রাজ্য, সাবধানে একটা দিক ধরে আস্তে-আস্তে তুলে নে।"

রাজ্যেশ্বরী কাগজটা তুলেই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। স্যুটকেসের তলায় রাশি রাশি লাল আর নীল পাথর বিছিয়ে আছে।

"চিনতে পারিস?"

রাজ্যেশ্বরী বাবার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "রুবি আর নীলকান্ত মণি।"

রুকু আর সুকু দু'পাশ থেকে দু'জনে ঝুঁকে পড়ল। টকটকে লাল আর আকাশের মতো নীল ছোট্ট-ছোট্ট পাথর।

সুকু বলল, "ওঃ, কিং সলোমন'স মাইন! দাদু, আপনি আমাদের নাম রেখেছেন, আমরা আপনার নাম রাখছি রাজা সলোমন।"

"সলোমন এক সময় রাজা ছিল, আজ আর রাজা নেই দাদু, ফকির হয়ে তোমাদের কাছে মরতে এসেছি।"

সুধীরঞ্জন হঠাৎ কেন এসেছেন কেউ জানে না। তিনজনেই অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, এমন সময় বাবা এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে, "তোমরা এখানে?"

সুকু বললে, "বাবা, এদিকে এসো, এসো এদিকে, দেখে যাও।"

ডক্টর মুখার্জি ঘরে এলেন। রুকুর মুখটা অসম্ভব গম্ভীর। দাদুর কথা তার মনে গিয়ে লেগেছে। ডক্টর মুখার্জি উঁকি মেরে দেখে বললেন, "আরে বাপ রে, এ তো রাজার ঐশ্বর্য। মোগকের রুবি আর স্যাফায়ার! আহা, দেখার মতো জিনিস!"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বাবা, আপনি হঠাৎ ওই কথাটা কেন বললেন?"

বৃদ্ধ হো হো করে হেসে বললেন, "রাজ্য, এই আমার শেষ সম্বল। বার্মা থেকে আসার সময় কোনও রকমে কিছু আনতে পেরেছিলুম। আর যা ছিল, মাইন-টাইন, ব্যবসাপত্তর সব ছেড়ে আসতে হল।

কলকাতায় ব্যবসা করার ব্যর্থ চেষ্টা করলুম কিছুকাল। জোচ্চোর এক অংশীদারের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হলুম, শরীরটাও গেল ভেঙে। এখন ভগবান ভরসা।”

রুকু চুপ করে থাকতে পারল না, “আমরা কি আপনার কেউ নই দাদু ?”

সুকু দাদাকে সমর্থন করল, “ঠিক বলেছিস দাদা।”

“তোমরাই তো আমার সব, তা না হলে লাট্টুর মতো ঘুরতে-ঘুরতে এখানে কেন আসব ?”

রাজ্যেশ্বরী বললেন, “ওসব কথা এখন থাক। পরে হবে।”

ডক্টর মুখার্জি বললেন, “আমি আপনার বড় ছেলের মতো। কী সর্বস্বান্ত, সর্বস্বান্ত করছেন ? জীবনে অনেক করেছেন, অনেক খেটেছেন, এখন পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম।”

রাজ্যেশ্বরী বললেন, “দেখ না ! বাবার চিরকালই একলা চলো রে স্বভাব !”

দাদু বললেন, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।”

সুকু বললে, “আমরা আসি রে। বাবা আসে, মা আসে, রুকু আসে, সুকু আছে রে, রে, রে।”

বাবা ছোট ছেলের মাথায় টকাস করে একটা গাঁট্টা মেরে স্ত্রীকে বললেন, “আমি এদিকে এক কাণ্ড করে বসে আছি। ইয়া বিরাট এক মাছ দিয়ে গেছে ডেভিড। কী করে কাটা যাবে তাই ভাবছি !”

রাজ্যেশ্বরী বললেন, “সে কী, তুমি একটা অত বড় সার্জেন, কেটে জোড়া লাগাও, সামান্য একটা মাছ দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছ ?”

“হাসপাতাল হলে ভয় পেতুম না, সোজা অপারেশন টেবিলে তুলে দিতুম, বাড়ি বলেই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।”

“তা হলে আমি আছি তোমার সংসারের সার্জেন।”

সুকু বললে, “কত বড় মাছ বাবা ?”

"দেখে যা না, ইয়া বড়।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বাবা, আমি এসে সব তুলে দিচ্ছি। যেখানে যা রাখার রেখে দোব।"

"তুই এই জেমসগুলো রাখার ব্যবস্থা কর আগে।"

"হ্যাঁ, এসে করছি।"

ছেলে, স্বামী, কুকুর, বেড়াল নিয়ে রাজ্যেশ্বরী মাছ কাটতে চললেন। বৃদ্ধ সুধীরঞ্জন একা বসে রইলেন খোলা স্যুটকেসের সামনে। মেয়ের সুখ দেখে তিনি ভীষণ সুখী হলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফেলে-আসা দিনের কথা। ব্রহ্মদেশ। মোগক, ম্যাণ্ডালয়, রেঙ্গুন, তাঁর রুবি মাইন, প্যাগোডা, বুদ্ধ, পাহাড়, সমুদ্র, ফুল, জল-উৎসব, বর্মা চুরুট, ধানখেত, হাতি। কত বন্ধু ছিল তাঁর ব্রহ্মদেশে! কত কর্মচারী ছিল তাঁর খনিতে! কী অদ্ভুত সুন্দর, শান্ত জীবন ছিল তাঁর! আর তো ফেরা যাবে না সেই সব দিনে! রাজ্য তখন এই এতটুকু। তাঁর এই জামাই তখন হাফ-প্যাণ্ট পরে ছুটে-ছুটে আসত তাঁর বাড়িতে। পাশাপাশি দুটি পরিবার। দুই বন্ধু। কোথায় ছিল রুকু, কোথায় ছিল সুকু। সুধীরঞ্জনের মনে হল, জীবন যেন একটা চৌবাচ্চা। এক নল দিয়ে জল ভরা হচ্ছে, আর-এক নল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও খালি হচ্ছে না। একদিকে সুখ, এক দিকে দুঃখ। সুধীরঞ্জন মুঠোমুঠো রুবি নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর জিনিস। রুবি সুন্দর, নীলকান্ত সুন্দর, রুকু সুন্দর, রাজ্য সুন্দর, বিমল সুন্দর, অ্যালবার্ট, শেলি সব সুন্দর। মুঠো মুঠো রুবি তুলছেন আর ফেলছেন। টিকির-টিকির শব্দ হচ্ছে। এই বয়সে জীবন খেলা ছাড়া আর কি! স্যুটকেসের ডালার খাঁজ থেকে ছোট্ট একটা বাঁশি বের করে সুধীরঞ্জন ফুঁ দিলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল, চাঁদের আলোয় রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা। সোনার চূড়ো সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। একেবারে মাথার ওপর মণি-

মাণিক্য বসানো ছোট্ট ছাতা। ঘণ্টা দুলছে টিংলিং, টিংলিং শব্দে। বিশাল বুদ্ধমূর্তি পাশ ফিরে, হাতে মাথা উঁচু করে শুয়ে আছেন। পাথরের খাঁজে খাঁজে আটকে আছে লাল টুকটুকে রুবি। সুধীরঞ্জন বাঁশিতে আবার ফুঁ দিলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ চলে গেল জানালার দিকে। ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কপালের ছু'পাশ দিয়ে ঝুমকো-ঝুমকো চুল নেমে গেছে কাঁধের দিকে। সুধীরঞ্জন প্রথমে ভেবেছিলেন ছবি। মুখ থেকে বাঁশিটা সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

মেয়েটি চটপট উত্তর দিল, "রেবেকা, সুকু'স ফ্রেণ্ড।"

সুকু এসে গেছে।

মেয়েটি মুঠো তুলে দেখাল। মুঠোয় কিছু ধরা আছে। সুকু জানালার দিকে দৌড়ে গেল। মেয়েটি সুকুর হাতে মুঠো খালি করে দিল। সুধীরঞ্জন দেখলেন, এক মুঠো বাদাম। সুকু বললে, "বাসকেটটা কোথায় ?"

মেয়েটি বাঁ হাতে করে একটা বেতের ঝুড়ি তুলে দেখাল! সুকুর মুখটা খুশি খুশি হল। সুধীরঞ্জন কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলেন না, "কী ব্যাপার দাছ ?"

সুকুর হঠাৎ খেয়াল হল মেয়েটির সঙ্গে দাছুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার, "দাছু, আমার বন্ধু রেবেকা। রেবেকা, আমার গ্র্যাণ্ডফাদার, কিং সলোমান। আমার দাছু হলেন রাজা। তুমি ভেতরে এসো না রেবেকা!"

"তুমি এখন বাইরে আসবে না ?" রেবেকা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ যাব তো, তার আগে তুমি এসো। আমার দাছুর সঙ্গে কথা বলো। তোমার দাছু আছেন রেবেকা ?"

"কী জানি ?"

"তুমি কিছুই জানো না, ওই জন্যে রাগ ধরে।"

"তুমি তো সব সময় রেগেই থাকো।"

দু'জনের কথা শুনতে সুধীরঞ্জনের ভারী মজা লাগছিল। জানালায় যেন দুটি পাখি এসে বসেছে।

সুকু বললে, "তোমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করলুম, তোমার মা আছে ? তুমি বললে, কী জানি। তোমার সবেতেই এক উত্তর কী জানি। ওই জন্যে মেয়েদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

"তাহলে আমি চলে যাই।"

"গেলেই হল ? কথায় কথায় অত রাগ কেন ? মেয়েদের রাগ ভাল নয়। মাছ-ভাজা খেতে হবে না ?"

"মাছ-ভাজা ?"

"বাংলা বোঝ না নাকি, ফিশ ফ্রাই। মা আমাকে ডিশ নিয়ে রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় জিভ বের করে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে বলেছে? তুমিও চলো?"

"আমি তো হ্যাংলা নই। তুমি একটা হ্যাংলা বেড়াল।"

সুকু দাদুর দিকে ফিরে বললে, "দেখছেন দাদু, আমাকে হ্যাংলা বলছে।"

"হ্যাংলা কি না জানি না, তবে তুমি একটা ঝগড়াটে বেড়াল। তুমিই তো খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আমার রেবেকার সঙ্গে ঝগড়া করছ।"

"আপনার রেবেকা? সুকু বুঝি আপনার কেউ নয়?"

"কী জানি?"

"ও, আপনাকেও কী-জানিতে ধরেছে?"

সুধীরঞ্জন হাসতে লাগলেন। সুকু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রেবেকার চুল ধরে টানতে লাগল, "বলো, ভেতরে আসবে কি না?"

সুধীরঞ্জন বললেন, "পালোয়ানের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও রেবেকা, ভেতরে চলে এসো। ও হল ভীম সিং পহেলবান, কাশীর গুণ্ডা।"

সুধীরঞ্জনের চোখের সামনে রেবেকার টিকলো নাকটা ভেসে উঠল। আহা, ওই নাকে লাল রুবি বসানো একটা নাকছাবি কী সুন্দর মানাবে? সুধীরঞ্জন খুঁজতে লাগলেন মনের মতো একটা রুবি। কোথায় গেল সেই পিজিয়নস ব্লাড, সবচেয়ে দামি, দুষ্প্রাপ্য রুবি। সত্যিই যদি আমি কিং সলোমন হতুম, সুন্দর একটা পৃথিবী তৈরি করতুম। সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বাগান, পথ ঘাট মন্দির গির্জা মসজিদ। সুন্দর-সুন্দর পোশাক পরা মানুষ। পৃথিবীর সব খনি থেকে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সাদা, ওপাল, হিরে, এমিথিস্ট অ্যাকোয়ামেরিন, স্যফয়ার, টোপাজ, টুরম্যালিন পেরিডট তুলে থরে থরে সাজিয়ে রাখতুম। রাত হলেই এক-আকাশ তারার নীচে বাড়িতে-বাড়িতে জ্বলে উঠত ঝাড়-লণ্ঠন। খাবার টেবিলে, সাদা কিংখাবের ঢাকা, লাল

আপেল, গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর, মিহি গানের সুর। প্রহরে-প্রহরে ঘড়ির শব্দ। গভীর রাতে রাস্তায়-রাস্তায় বৈতালিকের দল ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে বেড়াত। একটাও চোরজোচ্চর খুনে বদমানুষ থাকত না। চাঁদের আলোয় নীল আকাশে ঝাঁকঝাঁক ধবধবে সাদা পায়রা চক্কর দিয়ে উড়ত।

সুধীরঞ্জন আবার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। ছাড়াছাড়া একটা দুটো সুর। নদীর ধারে ছাউনি ফেলেছে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী। একটু আগেই তাঁবুর বাইরে বন্দী পুরুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, "তুমি আমার কাছে কীরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করো?" "রাজা রাজার নিকট যেরূপ ব্যবহার আশা করে।" পুরু মুক্ত হয়ে শিবিরে ফিরে গেছেন। নদীর ধারে গ্রীক সৈন্যরা এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। সাদা-সাদা ঘোড়া পা ঠুকছে। পাথরের ওপর বসে একজন গ্রীক সৈনিক বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে। দূরে সারি-সারি আগুনে আস্ত ভেড়া রোস্ট হচ্ছে। সত্যিসত্যিই ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি যেন। সুধীরঞ্জনের হাত থেকে বাঁশি পড়ে গেল। সারা শরীর কাঁপছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাইরে নয়, বুকের বাঁ পাশে। তিনি ধীরে-ধীরে লাল মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। চোখে জমাট অন্ধকার। স্মৃতি লুপ্ত হয়ে আসছে।

গরম মাছ-ভাজা প্লেটে নিয়ে রাজ্যেশ্বরী ঘরে এসেছিলেন বৃদ্ধ বাবাকে খাওয়াতে। অত বড় মাছ খেয়ে শেষ করতে হবে তো? "এ কী, বাবা, আপনি শুয়ে পড়েছেন? কী হল আপনার?"

সুধীরঞ্জন ঘোলাটে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তবু হাসার চেষ্টা করলেন। কিছু বলতে চাইলেন। অস্পষ্ট গোঙানির মতো শোনাল। সুধীরঞ্জনের হাতের আঙুলে ধরা ছোট্ট লাল রুবিটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। অস্পষ্ট সবই দেখতে পাচ্ছেন, কিছুই করতে পারছেন না, কিছু বলতে পারছেন না। রাজ্যেশ্বরী ছুটে বাইরে

বেরিয়ে গেলেন, "ওগো শুনছ, শুনছ, একবার এসো তো তাড়াতাড়ি।" চোখে রীডিং গ্লাস লাগিয়ে ডাক্তার মুখার্জি একটা ডাক্তারি বই পড়ছিলেন। স্ত্রীর গলা শুনেই বুঝেছিলেন, বিপদ। চটি দু'পাটিও পায়ে গলাবার সময় হল না। একপাটি টেবিলের অনেকটা তলায় ঢুকে গেছে।

"কী হয়েছে?" ছুটে এলেন।

"একবার চলো, বাবা কেমন করছেন।"

"সে কী?" ডক্টর মুখার্জি মোটেই বিচলিত হলেন না। এইটাই তাঁর শিক্ষা। যত বিপদই আসুক, সবসময় ধীর স্থির।

দু'জনে ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুধীরঞ্জন সেইভাবেই মেঝেতে পড়ে আছেন, মুখটা কালো হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ চোখ। দেখেই বুঝলেন, হার্টের ভাল্‌ভ কাজ করছে না। চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাতে গিয়ে দরজার সামনে রুকু আর রেবেকাকে দেখলেন।

"রুকু, চট করে আমার ব্যাগটা আনো।"

রেবেকা ভয়ে-ভয়ে পা টিপে টিপে ঘরে এল। কী আশ্চর্য! এইমাত্র সে মানুষটিকে ভাল দেখে গেল। বসে-বসে শিশুর মতো বাঁশি বাজাচ্ছেন। রেবেকা হাঁটু মুড়ে বসল। মা বলতেন, "লিটল রেবেকা, প্রার্থনার অনেক শক্তি। সেইভাবে যদি তুমি গডকে ডাকতে পার, অসম্ভবও সম্ভব হবে। প্রে অ্যাণ্ড প্রে।" মা কবে মারা গেছেন, মায়ের সব কথা এখনও মনে আছে। রেবেকা মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

ডক্টর মুখার্জি একটা ইঞ্জেকশন করলেন। স্ত্রীকে বললেন, সুধীরঞ্জনের বুকের বাঁ দিকটা ধীরে-ধীরে, অল্প-অল্প করে ঘষতে। রুকু কিন্তু এ-সবের কিছুই জানল না। সে বাগানের একেবারে শেষ মাথায় কাঠিকুঠি, বাসকেট, বাদাম, দড়ি নিয়ে মহাব্যস্ত। যেমন করেই হোক একটা কাঠবেড়ালি তাকে ধরতেই হবে। রেবেকাকে

কথা দেওয়া আছে। ওয়ান স্কুইর‍্যাল ফর রেবেকা।

ধীরে ধীরে সুধীরঞ্জন চোখ খুললেন। চোখ খুলেই বললেন, "সেই মেয়েটি কোথায়?" রেবেকা মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "এই যে আমি গ্র্যাণ্ড পা।"

"এইমাত্র আমি কী দেখলুম জানো? তুমি আমার হাত ধরে একটা মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠছ, ধাপে ধাপে। রাজ্য।"

"এই যে বাবা।"

"বিমল কোথায়?"

"এই তো আমি। এখন আপনি বেশি কথা বলবেন না।"

"না বলব না। বলতে পারবও না। শুধু একটা কথা, এই মেয়েটির মধ্যে একটা এঞ্জেল আছে। দ্যাখো তো, মেঝের ওপর একটা রুবি পড়ে আছে না?"

রাজ্যেশ্বরী রুবিটা খুঁজে পেলেন, "হ্যাঁ, বাবা, এই যে।"

"শোন, ওই রুবিটাকে বলে পিজিয়ন ব্লাড। বার্মার শ্রেষ্ঠ রুবি। ওই রুবিটা দিয়ে এই মেয়েটিকে একটা নাকছাবি গড়িয়ে দিস।"

"নিশ্চয় দোব বাবা। কিন্তু হঠাৎ আপনার কী হল?"

"হঠাৎ নয় রে, এইরকম আমার প্রায়ই হচ্ছে, সেই জন্যেই তো বিমলের কাছে আসা।"

সুধীরঞ্জনকে ধরাধরি করে খাটে শোয়ানো হল। জানালার পর্দাগুলো একে-একে টেনে-টেনে ঘরটাকে অন্ধকার মতো করে ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন, একদম নড়াচড়া করবেন না। আমি আপনাকে ভাল করে পরীক্ষা করব। দেখতে হবে ব্যাপারটা কী!"

॥ ৬ ॥

সুধীরঞ্জন একটু সুস্থ হয়েছেন। পেছনে বালিশ দিয়ে বিছানায় উঠে বসছেন। বইটই পড়ছেন। তবে অসুখটা খুব সহজে সারার নয়। প্রচুর ডাক্তারি বই আর জার্নালের মধ্যে ডক্টর মুখার্জি ডুবে আছেন। শেষ পর্যন্ত হয় রাঁচি কিংবা কলকাতাতে নিয়ে যেতে হবে সাবধানে। ডালটনগঞ্জে তেমন ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এদিকে বর্ষা বিদায় নিয়ে শরৎ এসে গেছে। আকাশের দিকে তাকালে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

সুকু কয়েকদিন বেশ চুপচাপ, লক্ষ্মী ছিল। মাঝে মাঝেই হৃৎপিণ্ডের ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করত দাদুর শরীরে গোলমালটা কোথায়! দাদু একটু সুস্থ হয়েছেন, এখন অল্প-স্বল্প দুষ্টুমি করা যায়। বারান্দায় মাদুর পেতে দুখিয়া শুয়ে আছে। একটা দড়ি দিয়ে ওর ডান পাটা জানালার সঙ্গে বেঁধে দিলে মন্দ হয় না। একটু পরেই মা ডাকবে, যেই হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে যাবে পায়ে টান লেগে উপুড় হয়ে পড়বে। বেশ মজা হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল। সেদিন বললুম, দুখিয়া আমাকে কাঁধে করে একটু উঁচুতে তুলে ধরো তো, পিচ গাছে গোটাকতক পাকা ফল ধরেছে ওপরের ডালে। পেড়ে আমার দাদুকে খেতে দোব। হ্যা হ্যা করে হেসে বললে, দাদুকে দেবে, না নিজে খাবে? ওসব আমি পারব না। তুমি একবার কাঁধে উঠলে আর নামতে চাও না। সেদিন 'হ্যাট ঘোড়া' 'হ্যাট ঘোড়া' করে আমাকে সারা বাগান ঘুরিয়েছ। ইঁট পেতে পেতে উঠতে গিয়ে ধড়াম করে পড়ে গেলুম।

সুকু দড়ির ফাঁস তৈরি করে পায়ে বাঁধল, আর একটা দিক বেঁধে দিল জানালার শিকে। তারপর ভাল মানুষের মতো মুখ করে দাদুর বিছানায় গিয়ে বসল।

"এই যে পালোয়ান, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি!"

"পড়ছিলুম দাদু।"

"হ্যাঁ, খুব ভাল করে পড়ো। বিশাল একটা মানুষ হতে হবে। কত কী আবিষ্কার করতে হবে। ভাল মানুষ কোথায়!"

"তিনি মায়ের বিছানায় ভোঁস-ভোঁস। দাদু, আপনি ভাল হয়ে আমাকে সেইটা শিখিয়ে দেবেন?"

"কোনটা দাদু!"

"মানুষের মনে ঢোকার কায়দা। সেই আপনার বার্মার গুরুর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন।"

"ও তো শেখানো যায় না দাদু, সাধনা করে শিখতে হয়।"

"আমি পারছি না দাদু।"

"মনে ঢুকতে?"

"না, আর একটা ব্যাপার। রেবেকাকে বলেছিলুম একটা কাঠ-বেড়ালি ধরে দোব, ও পুষবে। কাঠবেড়ালি কী করে অত চালাক হল দাদু? ভীষণ ছটফটে। দাদু, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্র-নাথের পিঠ বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠে কাঁধ বেয়ে নেমে যেত। সত্যি!"

"হ্যাঁ গো, সত্যি।"

"কেন উঠত? কই, আমার পিঠ বেয়ে তো ওঠে না। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে চোখ বুজে স্থির বসে থাকি, লাল লাল পিঁপড়ে ছাড়া কিছুই ওঠে না কেন?"

"মনে হিংসে থাকলে তো উঠবে না, দাদু।"

"হিংসে কাকে বলে?"

"কারুর ভাল সহ্য হয় না, কেউ সুখে থাকলে কষ্ট হয়, অন্যের

অনিষ্ট, ক্ষতি করতে ভাল লাগে। অন্যকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে, মারতে ইচ্ছা করে। আরশোলা দেখলে ঝ্যাঁটা পেটার ইচ্ছে হয়। পাখি দেখলে গুলতি ছুঁড়তে ইচ্ছে করে। ব্যাঙ দেখলে ঢিল মারার ইচ্ছে হয়। মুর্গি দেখলে খেতে ইচ্ছে করে। একে বলে হিংসে।”

“তা হলে খুলে দিয়ে আসি দাদু!”

“কাকে খুলে দিয়ে আসবে!”

“দুখিয়ার পায়ে দড়ি বেঁধে জানালার গরাদে লাগিয়ে রেখে এসেছি।”

“সে কী!”

“হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে। মা যেই ডাকবে, ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে টান লেগে পড়ে যাবে।”

“যাও যাও, এখুনি যাও, খুলে দিয়ে এসো।”

স্বকু উঠতে উঠতে শুনল, মা ডাকছেন, "দুখিয়া, দুখিয়া।" স্বকু দৌড়ল। দৌড়লে কী হবে, দেরি হয়ে গেছে। স্বকু যা ভেবেছিল তাই হয়েছে। এখন আর যাওয়া যায় না। মায়ের বকুনি খেতে হবে। সে আবার দাদুর ঘরে ফিরে এল।

"হয়ে গেল দাদু।"

"খুলে দিয়ে এলে ?"

"সময় হল না তো! ও উঠল আর ধড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কী হবে ?"

"কী আর হবে, মায়ের কাছে বকুনি খাবে।"

"আমি তা হলে পালাই।"

"পালাবে কেন ? অন্যায় করেছ বকুনি খাবে, এই তো নিয়ম। পরে আর অন্যায় করবে না, কাউকে কষ্ট দেবে না।"

স্বকুর কানে এল ও-পাশের বারান্দায় মা খুব বকাবকি করছেন। "বকুনিটা তাহলে খেয়ে আসি দাদু।"

"যেতে হবে কেন ? মা তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে, বকতে-বকতে এখানেই চলে আসবে।"

"না না, এ ঘরে বাবা চেঁচামেচি করতে বারণ করেছে।"

"সেই জন্যেই তো এখানে থাকবে। তুমি কি ভাবো, আমার মেয়ের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এ ঘরে সে চেঁচাতে পারবে না ফলে তোমার বকুনিও হবে না।"

ছ্যাড়াকার, ছ্যাড়াকার শব্দ উঠল বাইরের কাঁকুরে রাস্তায়। টাঙা আসছে একটা। শব্দটা খুব পরিচিত। ঘোড়ার পায়ের শব্দও

পাওয়া যাচ্ছে। সুকু উঠে গিয়ে জানালা ধরে দাঁড়াল। টাঙাটা গেটের সামনেই দাঁড়াল। বেশ চড়া গলায় আরোহী বললেন, "ক্যা, ইয়ে মকান? বহোত আচ্ছা। বাড়িয়া বাঙলো।" কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধুম করে একটা ভারী কিছু পড়ার শব্দ হল। সুকু ঘাড় ফিরিয়ে দাদুকে বললে, "কে একজন এলেন, শিকারীদের মতো পোশাক। কাঁধে একটা বন্দুক। কে বলুন তো দাদু?" সুকুর প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই, আগন্তুক গেটের কাছ থেকে চিৎকার করলেন, "কোই হ্যায়?"

রাজ্যেশ্বরী গেটের কাছে এগিয়ে গেছেন। কে এলেন এই নতুন মানুষটি! চিনতে পারছেন না।

"ম্যাডাম, এইটা কি ডক্টর মুখার্জির বাঙলো!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"সুধীরঞ্জন এখানে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আ বিশ্বাসঘাতক, সেলফিশ, জেলি ফিশ। আমাকে ফেলে পালিয়ে এসেছে। আই উইল কিল হিম। খুন করেগা। হি ইজ এ ডেজার্টার।"

সুকু ভয়ে-ভয়ে বললে, "দাদু, শুনতে পাচ্ছেন? আপনি খাটের তলায় ঢুকে পড়ুন। হাতে বন্দুক।"

রাজ্যেশ্বরী ভয়ে-ভয়ে বললেন, "তিনি খুব অসুস্থ।"

"অসুস্থ! সুধী অসুস্থ! তার তো পাথরের শরীর। কয়েকটা কড়াপাক খেলেই সুস্থ হয়ে যাবে।"

"কড়াপাক কী?"

"আ, ইগনোরেন্ট মহিলা! তুমি কড়াপাক জানো না! সিমালার বিখ্যাত কড়াপাক সন্দেশ, মরা মানুষ জ্যান্ত হয়।"

"কোনও শক্ত জিনিস তো তাঁর খাওয়া চলবে না।"

"কড়া পাক শক্ত? আ, হাউ ফানি! নামটাই কড়া, আসলে নরম, কুসুমের মতো কোমল! কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক?"

সুকু ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কে দাদু! গটগট করে বীরের মতো এগিয়ে আসছেন! ইয়া বড় বড় গোঁফ মাথায় টুপি।"

সুধীরঞ্জন বললেন, "ভয় নেই দাদু, আমারই ছায়া, মেজর কালী মুখার্জি। ঠিক খুঁজে-খুঁজে চলে এসেছে।"

নতুন মানুষ দেখে অ্যালবার্ট খুব ঘেউ-ঘেউ করছে। মেজর বলছেন, "আ, এ বার্কিং ডগ নেভার বাইটস।" নিজেই ছবার ডেকে উঠলেন ঘেউ ঘেউ। "মেয়ে, এটা কিসের ডাক?"

রাজেশ্বরী ভয়ে-ভয়ে বললেন, "মানুষের ডাক?"

"ও নো নো, এ হল খাঁটি অ্যালসেশিয়ানের ডাক। আবার শোনো, ঘেউ ঘেউ। আ রিয়েল অ্যালসেশিয়ান। তোমাদের কুকুরটা ডাকছে, ভ্যাক ভ্যাক। সেই পাজিটা কোথায়।"

"আজ্ঞে ওই ঘরে!"

"অ্যানাউন্স মাই অ্যারাইভ্যাল।" চিৎকার করে বললেন, "সুধী, আমি এসেছি।" মেজর মুখার্জির এক হাতে বেডরোল আর এক হাতে বিশাল এক স্যুটকেস, কাঁধে বন্দুক, মাথায় টুপি, পায়ে মিলিটারি বুট, বুক পকেটে উঁকি মারছে পাইপের ডগা, সুধীরঞ্জনের দরজার সামনে খাড়া ছ'ফুট লম্বা একটা দেহ। "এ কী, তুমি যে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছ। জানতুম। বরাতে তোমার অনেক দুঃখ আছে। চুক্তি ভঙ্গের অপরাধের সাজা। জুতো পরে ঢুকব? নাঃ থাক, মেঝেতে মুখ দেখা যায়। সায়েবি বাড়ি।"

দুমদাম করে হাতের মাল নামিয়ে জুতোর ফিতে খুলছেন। সুকু অবাক হয়ে মানুষটিকে দেখছে। জুতো খুলে মোজা পায়ে মেজর ঘরে ঢুকেই বললেন, "ম্যাডাম, তিন গেলাস জল। আমি চা খাই না। কফি। রাতে রুটি-মাংস। আমি তৃণভোজী প্রাণী নই,

মাংসখেকো।”

ঘরে একটা চেয়ার ছিল, ধপাস করে বসেই বুক পকেট থেকে পাইপ, পাশ-পকেট থেকে সরু একটা তার বের করে খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, “আমাকে না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন ?”

“মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে করল। কালী, মাই ডেজ আর নাম্বারড।”

“তুমি কি জ্যোতিষী ?”

“ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।”

“বর্তমানের অন্ধ ভবিষ্যতের চোখ নিয়ে ঘুরছ। বেশ মজা তো ! তোমাকে আমি হাজার দিন বলেছি, মৃত্যুর চিন্তা একদম করবে না। যখন আসবে আসবে। তোমাকে নিয়ে আমি তানজানিয়া যাব। সব প্ল্যান ফাইন্যাল করে এসেছি। মরলে দু'জনে একসঙ্গে মরব। তোমার সঙ্গে আমার এই চুক্তি ছিল। ছিল কি না ?”

রাজ্যেশ্বরীর দু'হাতে দু' গেলাস জল, দুখিয়ার হাতে এক গেলাস, “এই নিন আপনার জল।

“জল ? কফি কী হল ?”

“আগে তো আপনি জল চাইলেন !”

“তাই না কি ? তাহলে দাও।” মেজর হাঁ করলেন, হাতখানেক উঁচুতে গেলাস। জল পড়ছে হুড়হুড় করে। গলার কাছে গলকম্বলটা কেবল ওঠা নামা করছে। তিনি গেলাস জল শেষ। আ করে একটা শব্দ করলেন। শব্দে টেবিলের ওপর তিনটে খালি গেলাস চিনচিন করে কেঁপে উঠল।

সুধীরঞ্জন মেয়েকে বললেন, “রাজ্য, আমার এই বন্ধুটিকে তুই চিনিস না, মেজর কালী মুখার্জি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্ব আর সাহসিকতার জন্যে ভিকটোরিয়া ক্রস না কী একটা সম্মান পেয়েছিল। ও বলে, ও আমার ফেথফুল ডগ। আমি বলি, আমি ওর ফেথফুল

ডগ। তুই কাকাবাবুই বলিস। আমার চেয়ে বয়সে বছর চারেক ছোট।”

রাজ্যেশ্বরী প্রণাম করার জন্যে পায়ের কাছে মাথা হেঁট করতেই, মেজর ডান হাতের তালুটা রাজ্যেশ্বরীর মাথার পেছনে রেখে হাতটা তুলতেই ভুলে গেলেন। মুখে মিটিমিটি খুশির হাসি। সুকুর বেশ মজা লাগছিল। মা সোজা হতে পারছে না। হেঁট হয়ে আছে।

সুধীরঞ্জন বললেন, “ও হে হাতটা তোলো, আমার মেয়েটা সোজা হতে পারছে না।”

“অ্যাঁ, তাই না কি!” হাতটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। রাজ্যেশ্বরী গেলাস তিনটে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

মেজর মুখার্জি পাইপ ধরালেন, “তুমি তা হলে সেরে উঠছ কবে?”

“কী করে বলব, সে আমার জামাই জানে।”

“ধুস, তোমার শরীর তুমি মনের জোরে সারাবে, জামাই কী করবে? শোনো, এবারের প্ল্যানটা খুব জবরদস্ত্। এবার আর রুবি স্যফায়ার নয়, একেবারে হীরে। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। বুঝলে, বয়েস হয়ে যাচ্ছে, যা করতে হবে তাড়াতাড়ি। তোমার গরম সহ্য হয়?”

“তা হয়।”

“খুব জল তেষ্টা পায়?”

“না তেমন নয়।”

“হাঁটতে পারবে?”

“তা পারব।”

“ব্যাস, তা হলেই হবে। তিন বছরেই কোটিপতি। তোমার এক কোটি, আমার এক কোটি। তারপর গ্যাঁট হয়ে বসে বসে খাও। সাহস চাই, বুঝলে? ঘরে বসে প্যান-প্যান করলে কিছু পাওয়া যায় না। তোমার অসুখটা কী!”

"হার্টের একটা ভাল্‌ভ কাজ করছে না।"

"এই ব্যাপার! আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন? হার্টটাকে কয়েকদিন উলটে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"সে আবার কী!"

"খুব সহজ ব্যাপার।" মেজর ধপাস করে মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর কোমরের তলায় দুটো হাত থামের মতো ঠেকনা দিয়ে পা দুটো জোড় করে সোজা ওপর দিকে তুলে দিলেন। আর ঠিক সেই সময় রাজ্যেশ্বরী কফি আর কেক নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেজরের ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সামনেই রাজ্যেশ্বরী। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "মধু আছে?"

"মধু!" রাজ্যেশ্বরী অবাক।

"হ্যাঁ, মধু, হনি, হনি, মৌচাক।"

টেবিলে কফি রাখতে রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বুঝতে পেরেছি। মধু দরকার? আনিয়ে দোব।"

"দেখি বাগানে কয়েকটা মৌচাক বানাতে হবে।"

সুধীরঞ্জন বললেন, "মধু কী হবে?"

"আরে মধু হল হার্ট চাঙ্গা করার অমোঘ জিনিস। যোগী হেমকান্তর নাম শুনেছ?"

"না তো!"

"উঃ, তুমি একেবারে আকাট। যোগী হেমকান্ত এখন ইংলণ্ডে। কুইন এলিজাবেথকে যোগ শেখাতে গেছেন। তোমাকে যেভাবে দেখালুম, হার্টটাকে রোজ ওইভাবে কিছুক্ষণ উলটে রাখো, তোমার যা কিছু গণ্ডগোল এক মাসেই মেরামত হয়ে যাবে। বাঃ, কফিটা বেশ করেছ মেয়ে। কেকটাও সুস্বাদু? আরে, টাঙাঅলাকে ভাড়া দিতে ভুলে গেছি। আছে, না চলে গেছে?"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "চলে গেছে। আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"বাঃ বেশ করেছ, এই নাও।" ইয়া মোটা একটা ব্যাগ বের করে

মেজর রাজ্যেশ্বরীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

"এটা আমি কী করব?"

"আরে এর মধ্যে একগাদা নোটফোট আছে। কোথায় হারিয়ে ফেলব! লক্ষ্মীর কাছেই লক্ষ্মী থাক!"

"না না, আপনার টাকা আপনার কাছেই..."

"তার মানে? তুমি আমাকে দূরে রাখতে চাও। বেশ তা হলে চললুম। এখানে ধর্মশালা আছে?"

সুধীরঞ্জন মেয়েকে বললেন, "রেখে দে মা। খেপে গেছে। বড় অভিমানী! ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল তো!"

রাজ্যেশ্বরী হাত পেতে ব্যাগটা নিতে বাধ্য হলেন। মেজর মুখার্জি ভীষণ খুশি। হোহো করে ঘরকাঁপানো হাসি হেসে বললেন, "জেনে রাখো মা, আজ থেকে আমি তোমার আর-এক বুড়ো ছেলে। উৎপাত, বদমাইসি সবই সহ্য করতে হবে। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। তোমাকে আমি মা বলে ডাকব, ছোট-মা। বড়-মা ওই ওপরে, আমার ছোট-মা এই নীচে। এখানে বাজার আছে?"

"বাজার বলে কিছু নেই। সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে। আজ অবশ্য হাটবার।"

"তা হলে হাট থেকে একবার ঘুরে আসি।"

"এখন তো ভাঙা হাট। হাটে গিয়ে কী করবেন?"

"কেনাকাটা। খাদ্যদ্রব্য। হঠাৎ এসে পড়লুম তো।"

"বাড়িতে যা মজুত আছে সাত দিনেও শেষ করতে পারবেন না।"

"তাই না কি? আমার মায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা হলে একটু

দৌড়োদৌড়ি করে আসি। বুড়োটা বিছানায় পড়ে গেল? এখানে কোনও কালী-বাড়ি আছে?”

“হ্যাঁ আছে, মাইল খানেক দূরে, পশ্চিমে। একটা ছোট নদী আছে।”

“তাই নাকি? পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। সূর্যটাকে ধরে আনি।”

সুকুর ভারী, ভাল লেগে গেছে মানুষটিকে। কোনও রকমে রাজি করিয়ে যদি সঙ্গে আফ্রিকা যাওয়া যায়! দারুণ হবে। সুকু এগিয়ে এসে বললে, “ছোট্‌দাদু, আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমি খুব ছুটতে পারি।”

“আমার চেয়ে জোরে?”

“মনে হয়।”

“মায়ের অনুমতি নাও।”

“যাব মা?”

“সন্ধে হয়ে আসছে বাবা। রাস্তাটাও খুব নির্জন।”

“ছোট-মা, তোমার ভয় যেন ছেলেটাকে কাবু না করে ফেলে! পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনাই হল ভয়কে জয় করা। আমি সঙ্গে আছি কী করতে!” চলো কমরেড। মেজর উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতে পাইপ, আর এক হাতে পাইপ খোঁচাবার সিক। গম্ভীর গলায় বললেন,

The last of the light of the Sun
That had died in the West
Still lived for one Song more
In a thrush's breast

বাঙলোর পেছনের গেট খুলে বেরিয়ে এলেন মেজর মুখার্জি, সঙ্গে সুকু। আকাশ ফাগুয়ালাল। ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে। ঝিরিঝিরি গাছের পাতা উজ্জ্বল আকাশের গায়ে কালো হয়ে কাঁপছে,

নাচছে, হাসছে, খেলছে। সাঁকোর সামনে এসে মেজর বললেন, "স্টার্ট রানিং। ওয়ান, টু, থ্রী।" দৌড় শুরু হল। পথ নেমে গেছে ঢালু হয়ে নদীর দিকে! কাঁকরে জুতোর শব্দ উঠছে মচমচ করে। কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে উলটো দিকে। দু'পাশে সারি-সারি পাইন, ইউক্যালিপটাস, শাল, সেগুন, বাবলা। অনেক দূরে একজন লোক চলেছে সাইকেলে চেপে। মাঝে-মাঝে এক আধজন সাঁওতাল মেয়ে হাট থেকে ফিরছে। দৌড়, দৌড়।

॥ ৭ ॥

বেশ কয়েকদিন হল রেবেকা স্কুলে আসছে না। রেবেকা না এলে ক্লাসটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এত চেষ্টা করেও সুকু রেবেকার জন্যে একটা কাঠবেড়ালি ধরতে পারেনি। বাগানের কোণে কাঠি দিয়ে ধামা উঁচু করে তলায় চিনেবাদাম ছড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, কাঠবেড়ালি পাশ দিয়ে চলে গেছে, ধামার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে ছড়ানো চিনেবাদাম তাকিয়ে দেখেছে, কিন্তু ফাঁদে পা দেয়নি। সেদিন সুকুদের বাড়িতে একটা লোক ধামা, চুবড়ি, কুলো বেচতে এসেছিল, তাঁর কাঁধে বসে ছিল একটা বেজি। গলায় একটা সরু দড়ি বাঁধা। সুকু জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করে ধরলে গো?" লোকটা বলেছিল, "আপুনা থেকে হামার কাছে আসিয়ে গেল।" তার মানে ওর মনে হিংসেটিংসে ছিল না। সাধুর মতো মানুষ। দু'ভাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। সুকু জিজ্ঞেস করল, "দাদা, আমার হিংসেটা একটু কমেছে রে?"

রুকু ভেবে বলল, "মনে হয় সামান্য কমেছে। তোর কোনও জিনিসে হাত দিলে আগের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করিস না।"

"তা করি না ঠিকই, তবে মনে ভীষণ কষ্ট হয়, চেপে থাকি। এই যেমন আমার গন্ধঅলা ভাল ইরেজারটা তোর ব্যাগে। তুই যতবার কাগজে ঘষবি আমার বুকটা কেমন করে উঠবে।"

"তা হলে নিয়ে নে।"

"না না, তোর কাছে রাখ, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে কাগজে ঘষ। মাঝে-মাঝে দাঁত দিয়ে কামড়া। কালকে আমার সবচেয়ে

ভাল কলমটা তোকে দিয়ে দোব। দাদা, তুই বাড়ি যা, আমি একবার রেবেকার খবর নিয়ে আসি।"

"সে তো অনেক দূরে রে। তোর তা হলে ফিরতে দেরি হবে।"

"মাকে একটু বুঝিয়ে বলিস দাদা।"

রুকু ঘাড় নেড়ে মন খারাপ করে চলে গেল। সুকুটা বাড়িতে না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। আজ দু'জনেরই টার্মিন্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। দু'জনেই প্রথম হয়েছে। একটা টাঙা গেল তরিতরকারি বোঝাই। চার্চে যাচ্ছে। রাঁচির টাটকা কপি, এক ঝুড়ি লাল টোম্যাটো, বীনস। টাটকা সবজি দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একটা গাজর রাস্তায় ছিটকে পড়ল। রুকু তুলে নিয়ে প্যান্টের পেছনে ভাল করে মুছে খেতে খেতে বাড়িমুখো হল।

রেবেকাদের বাড়িটা বাজারের দিকে। সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যেতে হয়। হলের সামনে ব্যাণ্ড বাজছে। বাইরে রঙিন পোস্টার হরারস অব ড্রাকুলা। একটা বীভৎস মুখ, এত বড়-বড় দাঁত। ছবিটা মোটেই ভাল লাগল না। পাশেই চিনেবাদাম বিক্রি হচ্ছে।

রেবেকার জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। পকেটে কিছু পয়সাও আছে। একটা স্টেশনারি দোকান থেকে সুকু কিছু চকোলেট কিনল। চকচকে রাংতা মোড়া। রেবেকাদের বাড়িটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজানো বাগান। সাদা রং করা কাঠের গেট। সুকু বারান্দায় উঠে ডাকল, "রেবেকা রেবেকা।" কোনও সাড়া নেই। আবার ডাকল, "রেবেকা।"

রেবেকাদের আয়া বেরিয়ে এসে বললে, "রেবেকার খুব অসুখ।"

"কোথায় সে?"

"শুয়ে আছে।"

সুকু শোবার ঘরে এসে দেখল, রেবেকা কপালে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার।

"রেবেকা।"

হাত সরিয়ে রেবেকা তাকাল, "সুকু, আমার জ্বর হয়েছে।"

সুকু কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখল। বেশ গরম। "তোমার বাবা কোথায়?"

"বাবা রাঁচি গেছেন।"

রেবেকার বাবা রেলে চাকরি করেন। সুকু বলল, "কবে আসবেন? তোমার জ্বর দেখে গেছেন।"

"না বাবা যেদিন গেলেন, সেদিন বিকেলে জ্বর এল। তিন দিন পরে ফিরবেন।"

"বাড়িতে তুমি একলা আর তোমাদের আয়া?"

"হ্যাঁ, আর কে থাকবে বলো?"

"ওষুধ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ, ফাদার রুপার্ট এসেছিলেন।"

"তুমি আমাদের বাড়িতে চলো।"

"না সুকু। আমি বেশ আছি। আমার কে আছে বলো। একলাই তো আমাকে থাকতে হবে।"

"তার মানে? আমি আছি, আমার দাদা, মা বাবা দাদু আর এক দাদু আছেন। চলো শিগগির। বাবার ওষুধ খেলে সব সেরে যাবে।"

"না সুকু। আমার বাবা রাগ করবেন।"

"তোমার বাবাকে, আমার বাবা বলবেন। নতুন যে দাদু এসেছেন, তিনি সাংঘাতিক মানুষ। তোমার খুব মজা লাগবে।"

"না সুকু, তোমার মা রাগ করবেন।"

"আমার মা? আমার মাকে তুমি চেনো না। চলো তুমি।"

"না সুকু।"

"আবার না? দেখবে তা হলে?" টেবিলের ওপর একটা

দেশলাই পড়েছিল। সুকু দেশলাইটা তুলে নিয়ে একটা কাঠি জ্বালাল খচাত করে। “এই আগুনে আমার হাতের প্রত্যেকটা আঙুল পোড়াতে থাকব।”

রেবেকা ধড়মড় করে উঠে বসল, “না সুকু, না, লক্ষ্মীটি না। তুমি বুঝে ছাখো আমি গেলে বাড়ি কে দেখবে?”

“তোমাদের আয়া দেখবে। আমাকে যা-তা বোঝাতে এসো না।”

সুকু আর-একটা কাঠি জ্বালাল, “হ্যাঁ কি না, বলো হ্যাঁ কি না?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাব।”

সুকু দেশলাইটা ফেলে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল একটা টাঙা চলেছে। দু’জনে দুলতে দুলতে চলেছে। সন্ধ্যা নামছে বেশ জাঁকজমক করে, চারপাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

সুকু ডাকল, “রেবেকা।”

“উঁ।”

“কষ্ট হচ্ছে।”

“না তো।”

“আজ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে জানো? তুমি সেকেণ্ড হয়েছ। আমি ফাস্ট। তুমি এগ্রিগেটে আমার চেয়ে মাত্র পনেরো নম্বর কম পেয়েছ।”

কোথায় যেন দুটো পাখি টুইট টুইট করে ডাকল। সুকুর মনে পড়ল, দাদু বাইনোকিউলার দিয়েছেন। বাবা দিয়েছেন পাখির বই। কাল সকাল থেকেই পাখি চিনতে বেরোতে হবে।

টাঙাটা বাড়ির কাছাকাছি এসেছে। সুকু দূর থেকেই দেখছে কে একজন ছুটছেন। এইভাবে ছোটাকে বলে জগিং। এ আর কেউ নয়, মেজার মুখার্জি! সুকুদের টাঙা বাংলোর সামনে পৌঁছনোর আগেই মেজর মুখার্জি গেটের সামনে পৌঁছে গেছেন। তখনও আশ

মেটেনি। ধীরে ধীরে লাফাচ্ছেন। সুকু বললে, "রেবেকা, চোখ চেয়ে ছাখো, ওই আমার ছোট দাছু।"

রেবেকা জ্বরের ঘোরে ভাল করে তাকাতে পারছে না। তবু একবার চাইল।

টাঙাটা থামতেই মেজর বললেন, "আরে সুকু যে, তুমি তো আচ্ছা ছেলে। কোথায় থাকো সারাদিন! তোমার জন্যে এমন বিকেলটা আজ মাটি হয়ে গেল।"

"কী করব ছোট দাছু? রেবেকাকে দেখতে গিয়েছিলুম। এই দেখুন না নিয়ে এসেছি। ভীষণ জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? এখানেও জ্বর হয়? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি কোলে করে নামাই।"

মেজর পাঁজাকোলা করে রেবেকাকে টাঙা থেকে তুলে নিলেন। সুকু লাফিয়ে নামল। রাজ্যেশ্বরী বাগানেই পায়চারি করছিলেন। এগিয়ে এলেন গেটের কাছে। উদ্বিগ্ন গলা। "কী হয়েছে রে সুকু?"

"আর বলো কেন মা? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এদিকে ওর বাবা চলে গেছেন রাঁচিতে। কেউ দেখার নেই। আসছিল না। জোর করে নিয়ে এলুম। তুমি মা টাঙা ভাড়াটা দিয়ে দাও।"

মেজরের কোল থেকে নিজের কোলে রেবেকাকে নিয়ে রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আমার চশমার খাপে টাকা আছে, তুই দিয়ে দে না বাবা, আমি মেয়েটাকে দেখি।"

রেবেকা রাজ্যেশ্বরীর বুকে মুখ গুঁজে বললে, "মাদার, আই অ্যাম সরি।"

মেজর বললেন, "মেয়ে, গরম জলে নুন ফেলে ফুটবাথ, তারপর কম্বল চাপা, তারপর ঘাম দিয়ে জ্বরের পলায়ন, তারপর গরম রুটি, ঝালঝাল মাংসের ঝোল।"

রাজ্যেশ্বরী রেবেকাকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোলেন। গোটাকতক

সাদা গোলাপ তখনও অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি। বাতাসে মাথা নাড়ছে। হাসনুহানার ঝোপ থেকে ফুলের তীব্র গন্ধ বলছে, রাত হল, রাত হল।

রাতের দিকে রেবেকার জ্বরটা খুব বাড়ল। ডক্টর মুখার্জি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িতে দু দু'জন রোগী। সুধীরঞ্জন একটু সামলেছেন ঠিকই, তবে একেবারে সুস্থ হবেন কি না ঈশ্বরই জানেন। রেবেকা রাজ্যেশ্বরীর ঘরে তাঁরই খাটে শুয়ে আছে। মাঝে-মাঝে ভুল বকছে। কখনও বলছে "আর মেরো না বাবা, ভীষণ লাগছে।" কখনও বলছে, "আমার অঙ্কর খাতাটা কোথায় রাখলে মা?"

রাজ্যেশ্বরীর চোখ ছলছলে, "ফুলের মতো এমন একটা মেয়েকেও লোকে মারে?"

মেজর ভাবছেন, পৃথিবীতে মা জিনিসটা কী অপূর্ব! মায়ের কাছে আপন নেই, পর নেই, সন্তানের কোনও জাত নেই।

সুধী যেমন, সুধীর মেয়েটাও তেমন। মেজর বললেন, "মেয়ে, রেবেকাকে আমার ঘরে দাও, আমার তো সারারাত ঘুম হয় না, জেগেজেগে সেবা করব।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "একটু বরফ পেলে ভাল হত, মাথায় বোধহয় আইসব্যাগ চাপাতে হবে।"

মেজর বললেন, "বরফ? সে তো বাজারে, সিনেমার ধারে পাওয়া যাবে, আমি এনে দিচ্ছি। সাইকেল আছে, ভয় কী?" তিনি সাইকেল নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

সুধীরঞ্জন রুকু আর সুকুকে বললেন, "ভয় নেই, দেখবে কালই জ্বর ছেড়ে যাবে।"

৮ ॥

গভীর রাতে মেজর মুখার্জি ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা ম্যাপ বিছিয়ে বসলেন। সুধীর ভরসায় থাকলে তানজানিয়াতে হীরের সন্ধানে যাওয়া হবে না। ফুটো হার্ট নিয়ে সুধী কালাহারি মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবে না। একলাই যেতে হবে। তিনি ম্যাপে আফ্রিকার তলার দিকে নেমে এলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম দিকে এই তো স্কেলিট্যান কোস্ট। কঙ্কাল তটভূমি।

"ছোট দাছু, আসব ?"

মেজর মুখার্জি চোখ তুলে তাকালেন। দরজায় সুকু। চার্চের ঘড়িতে বারোটা বাজছে।

"তুমি এখনও ঘুমোওনি ? রেবেকা কেমন আছে এখন ?"

"মায়ের পাশে ঘুমোচ্ছে। আপনি ম্যাপ দেখছেন কেন ?"

"আমাকে যে অনেকদূর যেতে হবে দাছু, ভাগ্যের সন্ধানে। এই আমার শেষ লড়াই।"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন ? আমার বাইনোকিউলার আছে, এয়ারগান আছে, ছররা আছে জলের বোতল আছে, বুট জুতো আছে ?"

"সাহস আছে ?"

"আমার ভীষণ সাহস আছে।"

"আচ্ছা সুকু, এখানে ফোলডিং কোদাল পাওয়া যায় !"

"ফোলডিং ছাতা হয়, কোদাল হয় বলে তো শুনিনি।"

"বিজ্ঞানের যুগে সব হয় সুকু। এখানে ভাল কামারশাল আছে ?"

"হ্যাঁ, যেখানে হাট বসে, সেখানেই আছে উচিতলালের কামারশাল।"

"দেখি, কাল সকালে একবার যেতে হবে। একটা ভাল কুকুর চাই।"

"কেন, অ্যালবার্ট আছে, আমাদের অ্যালবার্ট। ওর সাংঘাতিক বুদ্ধি!"

মেজর মুখার্জি আবার ম্যাপ নিয়ে পড়লেন। সুকুও হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাল পেনসিল দিয়ে ম্যাপের একটা জায়গায় গোল দাগ মারলেন। সুকু বললে, "ওইখানে হীরে পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, দাদু। এই হল স্কেলিটান কোস্ট। একদিকে সমুদ্র অন্য-দিকে আশি মাইল বিস্তৃত সাংঘাতিক মরুভূমি, কালাহারি।"

"স্কেলিট্যান কোস্ট নাম হল কেন? ওখানে কি কঙ্কাল পড়ে আছে?"

"এই তটভূমিতে বহু যুগ ধরে বহু মানুষ জাহাজে, নৌকোতে নামার চেষ্টা করেছে। যারাই চেষ্টা করেছে, তারাই মরেছে। দক্ষিণ থেকে পুবে সাঁসাঁ করে অনবরতই ঝড় বইছে। বর্শার ফলার মতো বালি উড়ছে। পালিশ করা কিংবা রঙ করা ধাতুর টুকরো ধরে রাখলে একঘণ্টায় ওই বালির ঘষায় সব রঙ উঠে মেটাল বেরিয়ে পড়বে। ওই তটভূমিতে দুশো তিনশো বছর আগেকার বড় বড় জাহাজের কঙ্কাল এখনও কাত হয়ে পড়ে আছে। সাহসী নাবিকদের কঙ্কাল বালির তলায় চুন হয়ে গেছে। কোনও মানুষ ওখানে গেলে বেঁচে ফিরে আসে না।"

"তাহলে আমরা কী ভাবে যাব?"

"আমরা সমুদ্রপথে যাব না। গেলেও আমরা ডার্বানে নামব, সেখান থেকে জোহানসবার্গ, মাফেকিং হয়ে কালাহারি। একটা গগলস চাই।"

"দাদার গগল্‌স আছে, আপনাকে চেয়ে দেব ?"

"আমার চোখে লাগবে ? আমার মুখটা তো একটু বড় !"

"এখন আনব ?"

"এত রাতে ? থাক। কাল সকালে হবে। মাফেকিংয়ে একটা উট ভাড়া করব, তারপর কালাহারির ভেতর দিয়ে চলে যাব বাটসোয়ানা। ওখানে কিছু করতে পারব না। ডিবিয়ার কোম্পানি সব দখল করে বসে আছে। উইনধোকার পাশ দিয়ে একেবারে সমুদ্রের তীরে। লম্বা ফলাঅলা একটা ছুরি চাই। ছোট্ট একটা তাঁবু ফেলব আর রোজ সকাল বেলা সেই ছুরির ফলা দিয়ে বালি উসকে উসকে হীরে খুঁজব। প্রথমে ছোট ছোট পাব, তারপর বলা যায় না হোপ ডায়মণ্ডের মতো বিশাল একটা হীরেও পেয়ে যেতে পারি ভাগ্য ভাল হলে। সুধীটা সঙ্গে থাকলে কত ভাল হত ?"

"হোপ ডায়মণ্ড কী, দাদু ?"

"উরে বাপ রে, রাত্তির বেলা ওর নাম কোরো না। সারা পৃথিবীতে ওই হীরের জন্যে কম খুনখারাপি হয়েছে। মৃত্যু, আত্মহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ। অভিশপ্ত হীরে। রংটা হল স্টীল ব্লু। ওজন ৪৫.৫২ ক্যারাট। ক্যারাট কাকে বলে জানো ? একটা ক্যারব বীজের ওজনকে বলে ক্যারাট। ওজন ১/৪২ আউনস, তার মানে দশ গ্রাম ওজন। এই বিখ্যাত হীরে, বিখ্যাতই বলো আর কুখ্যাতই বলো, এখন আছে এক মার্কিন ধনকুবেরের হাতে, নাম এভালিন ওয়ালশ ম্যাকলিন।"

চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটা পাখি ডেকে উঠল। গা ছমছম করানো ডাক। দূরে একপাল কুকুর কাঁদছে। মেজর মুখার্জি বললেন, "ওই কালাহারিতে কত প্রেত ঘুরছে ? হীরের সন্ধানে গিয়ে পথ হারিয়ে, গরমে, না খেয়ে, জল না পেয়ে তিল-তিল করে মরেছে।"

"অমন একটা জায়গায় নাই বা গেলেন ছোট দাদু। কী হবে হীরে ?"

"তুমি বুঝবে না সুকু। জীবন তো পুষে রাখার জিনিস নয়, জীবনকে উড়িয়ে দিতে হয় পাখির মতো। কত দেশ, কত বন, উপবন, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত জীবন জীবিকা অ্যাডভেনচার। তোমার হাই উঠছে, যাও, এবার শুয়ে পড়ো। কাল সকালে মনে থাকে যেন বেড়াতে যেতে হবে। ম্যাপের ওপর মেজর আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রাত প্রায় একটা হল। সুকু উঠে পড়ল। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল সারা ডালটনগঞ্জ ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বাবার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত বাবা পড়াশোনা করেন। এক আকাশ তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলছে।

সুকু বাগানে নামল। একটু ঘুরে নিজের ঘরে যাবার ইচ্ছে। অনেক ফুল আছে যা শুধু রাতেই ফোটে। ফুল যখন ফোটে তখন কি কোনো শব্দ হয়? সারা বাগানটা যেন ফিসফিস করছে। সুকু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল "কে?" সামনেই একটা সাদা মূর্তি। সুকুকে দেখে হনহন করে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সুকু আরও জোরে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি, দাদু?"

মেজর মুখার্জি বেরিয়ে এসেছেন, "কে সুকু?"

"কোনও উত্তর দিচ্ছেন না।"

বাবাও বেরিয়ে এসেছেন, "কে সুকু?"

"বোধহয় দাদু?"

"দাদু সে কী? দাদু কেন এখন বেরোবেন?

"মেজর মুখার্জি সাদা মূর্তিটাকে অনুসরণ করলেন। গেট খুলে মূর্তি ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। মেজর ডাকছেন, "সুধী, সুধী কোথায় চলেছ। এত রাতে তুমি একা-একা কোথায় চললে? সুধী সুধী?"

সুকু দৌড়ে দাদুর ঘরে গেল। রাজ্যেশ্বরীও উঠে পড়েছেন। সুকু

অবাক হয়ে গেল, দাদু তো শুয়েই আছেন।

"মা দেখবে এসো, দাদু তো শুয়েই আছেন। তবে উনি কে?"

রাজ্যেশ্বরী ছুটে এলেন, "বাবা, বাবা।"

কোনও সাড়া নেই। ডাক্তার মুখার্জি এসেছেন, "কী হল। সাড়া নেই?"

রাজ্যেশ্বরী কাঁদো-কাঁদো, "বাবা, বাবা। দেখে যাও গাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।"

ডক্টর মুখার্জি নাড়ি দেখলেন। সব শেষ। স্ত্রীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনা নেই। রুকু আর স্বকু স্তব্ধ। দুচোখে জল। দাদু নেই। কেন নেই। বাগানের গেট খুলে কে চলে গেলেন? রাজ্যেশ্বরী ফুলে ফুলে কাঁদছেন। এই তো সন্ধেবেলা ভালই ছিলেন। কত কথা হল। রাতের খাবার খেলেন, ওষুধ খেলেন। মৃত্যু কি এইভাবেই হঠাৎ আসে?

চার্চের ঘড়িতে রাত দুটো বাজল। রেবেকা খুব ঘুমোচ্ছে। জ্বরটা একটু কমেছে।

॥ ৯ ॥

পুলিস অফিসার বললেন, "দেখুন আমরা গত তিন দিন সারা ডালটনগঞ্জে ঢুঁড়ে ফেললুম কিন্তু কোথাও সেই ভদ্রলোকের সন্ধান পেলুম না। । আপনারা একটা ছবিও দিতে পারছেন না। একটি ছবি পেলে আমাদের কাজের সুবিধে হত।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "পাইপ আর একপাটি জুতো যে জায়গায় পেলেন, সেই জায়গাটা আর একটু ভাল করে দেখলে হত না?"

"খুব ভাল করে দেখেছি। একপাশে পাহাড় আর একপাশে গভীর খাদ। বহু নীচে নদী বয়ে চলেছে, কাঁটাঝোপ। আর কীভাবে দেখব বলুন? আমার মনে হয় ভদ্রলোক কলকাতায় চলে গেছেন।"

"একপাটি জুতো পরে কেউ কোথাও যেতে পারে?"

"তা হলে খালি পায়ে গেছেন। কলকাতার ঠিকানাটা দিতে পারেন?"

ডক্টর মুখার্জি উঠে পড়লেন। এমন একজন মানুষের সন্ধান চাই, যাঁর ছবি নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই। পাহাড়ের তলায় একটা ঝোপে পাইপ আর একপাটি জুতো। মানুষটা কোথায়? পাহাড়ের মাথায় না খাদে? পাহাড়ের রেঞ্জ এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে। কে খুঁজবে সেখানে। খাদটা এত গভীর যে কেউ শখ করে নামবে না ঠেলে ফেলে না দিলে।

ডক্টর মুখার্জি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। পাহাড়ের দিকেই একবার যাবেন। নিজের দেখা আর অন্যের দেখায় অনেক তফাত। রাস্তা

ক্রমশ উঁচু হতে হতে আবার ঢালু হয়ে নীচের দিকে নামছে। আবার উঠছে ওপরে। মাঝে-মাঝে আদিবাসীদের গ্রাম। রাখাল চলেছে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে! গাড়ির শব্দে ছাগল ছুটছে।

এবারে দুপাশে খালি পাথর আর বন। জৈনদের একটা মন্দির পেরিয়ে গেলেন। গাড়িটা একপাশে রেখে হাঁটা পথ ধরলেন। এ-পথে গাড়ি আর চলবে না। দূরে বহু পাখি উড়ছে। আকাশে চক্কর মারছে গোল হয়ে। দেখেই বুঝলেন শকুন উড়ছে। শকুন মানেই মৃত্যু, মৃতদেহ। বুকটা ছাঁত করে উঠল।

ডক্টর মুখার্জি পায়ে পায়ে খাদটার ধারে এলেন। ধাপে ধাপে নেমে গেছে বড় গাছ ছোট গাছ। ডালে ডালে শকুন বসে আছে। কিছু নেমে গেছে আরও তলায়। খ্যাখ্যা আওয়াজ করছে। কিছু উড়ছে, কিছু উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। নির্জন পাহাড় আর বনানীতে যেন তাণ্ডব চলছে। মৃতদেহ-লোভী কিংবা মানুষ!
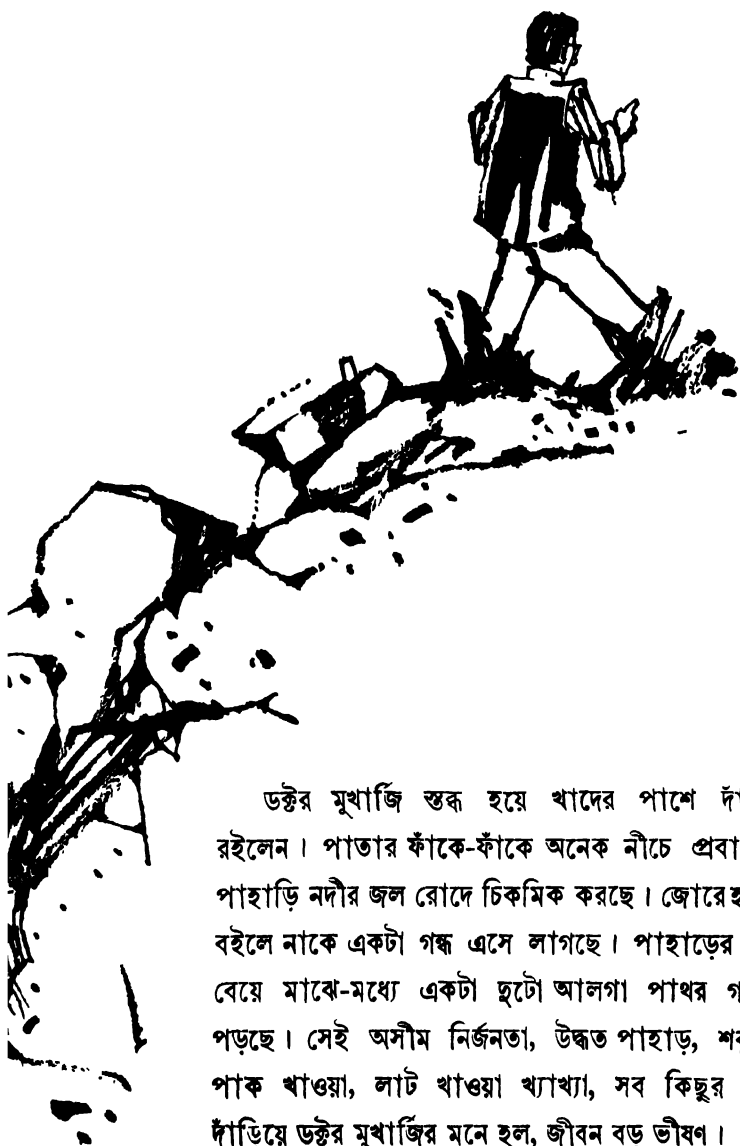
ডক্টর মুখার্জি স্তব্ধ হয়ে খাদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক নীচে প্রবাহমান পাহাড়ি নদীর জল রোদে চিকমিক করছে। জোরে হাওয়া বইলে নাকে একটা গন্ধ এসে লাগছে। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে মাঝে-মধ্যে একটা ছুটো আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ছে। সেই অসীম নির্জনতা, উদ্ধত পাহাড়, শকুনের পাক খাওয়া, লাট খাওয়া খ্যাখ্যা, সব কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে ডক্টর মুখার্জির মনে হল, জীবন বড় ভীষণ।

গাড়িটাকে ঘুরিয়ে তিনি আবার থানার দিকে ফিরে চললেন।

এদিকে রাজ্যেশ্বরী আলমারি খুলেছেন। বাবার

জামা-কাপড়, চশমা। স্মৃতি, শুধু স্মৃতি। কাপড়ের ভাঁজের তলায় সেই ব্যাগটা। মেজর মুখার্জির ব্যাগ। যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রেখে দিয়েছেন। ব্যাগটা খুললেন। প্লাস্টিকের স্বচ্ছ পকেটে মা কালীর ছবি, সামান্য সিঁদুর মাখানো। ভেতরে পাটে পাটে একশো টাকা, পঞ্চাশ টাকা, দশ টাকার নোট। আবার মুড়ে রাখলেন। কার টাকা, কে রাখে!

ওদিকে রুকু আর সুকু বসে আছে মেজর মুখার্জির ঘরে। সে-রাতে যেখানে যে জিনিস যেভাবে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলেন সব ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। পুলিস বলেছে কোনও জিনিসে হাত দেওয়া চলবে না। মেঝের ওপর ম্যাপটা সেই একই ভাবে বিছানো। তার ওপর লেনস, পাইপ, একটা পেনসিল। আফ্রিকার স্কেলিট্যান কোস্টের কাছে গোল একটা বৃত্ত।

দু' ভাই মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসে আছে। সুকু বললে, "দেখ দাদা, আমাদের আর বড় হয়ে দরকার নেই। বড় হলেই মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, বুড়ো হলেই জীবনটা যেন কেমন হয়ে যায়! মা থাকে না, বাবা থাকে না, কেউ থাকে না। হঠাৎ একদিন মরে যায়। আয়, আমরা যেমন আছি, তেমনই থাকি।"

"ঠিক বলেছিস সুকু। কিন্তু আমরা যে কেবলই বড় হয়ে যাচ্ছি। লম্বা হয়ে যাচ্ছি।"

"কোনও ভাবে বড় হওয়াটা বন্ধ করতে হবে। কী করে করা যায় বল তো?"

"চল ফাদারকে জিজ্ঞেস করে আসি। ফাদার সব জানেন।"

সুকুর কাঁধে রুকুর হাত। দু' ভাই বাগানের রাস্তা ধরে হাঁটছে। বাগানের শেষে বেড়া। বেড়ার পর ঢালু হয়ে জমিটা চার্চের পেছন দিকে নেমে গেছে। গির্জার চুড়োটা উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। রঙ বেরঙের কাচ বসানো লম্বালম্বা জানালা। ঝোপের

পাশে সাদা দুটো খরগোশ।

পা পর্যন্ত সাদা পোশাক পরে ফাদার প্রেয়ার রুমের দিকে যাচ্ছিলেন। দু' ভাই বিষণ্ন মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"হ্যালো মাই সানস।"

"ফাদার, একটা প্রশ্ন।"

"বলো।"

"ফাদার, কেমন করে ছোটই থাকা যায়, আমরা আর বড় হতে চাই না।"

"হোয়াই, কেন তোমরা বড় হতে চাও না?"

"বড় হলেই মানুষের দুঃখ হয়, অসুখ হয়, মারা যায়, হারিয়ে যায়।"

"ট্রু। ঠিক। ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমাদের আমি যদি মৃত্যুকে জয় করার কৌশল শিখিয়ে দিই, দুঃখকে জয় করার কৌশল শিখিয়ে দিই? চলো আমার সঙ্গে।"

তিন জনে প্রেয়ার রুমে এলেন। সামনেই ক্রুশবিদ্ধ যিশু। সারা মুখে স্বর্গের হাসি। "তোমরা ওই পালপিটের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। মৃত্যু ওই মহামানবকে পরাজিত করতে পারেনি। বুদ্ধ, মহাবীর, তোমাদের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, এঁদের কাউকেই মৃত্যু কিছু করতে পারেনি। এঁরা বড় হতে হতে বড় হতে হতে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে বসে আছেন। তোমরাও তাই হও।"

একটা, দুটো, তিনটে বাতি জ্বলে উঠছে। দু' হাতে, দু পায়ে পেরেক মারা, মাথায় কাঁটার মুকুট, যিশু ক্রশে ঝুলছেন, তবু মুখে অমলিন হাসি। বাতির আলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফাদার হেঁট হয়ে একের পর এক বাতি জ্বেলে চলেছেন। একজন, দুজন করে সকলে সমবেত হতে শুরু করেছেন। হঠাৎ অরগ্যান বেজে উঠল। বিশাল হলের দেয়ালে দেয়ালে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সুর আছড়ে পড়ল।

ফাদার লকহার্ট ওককাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়ছেন :

Since you are God's dear children.
You must try to be like Him.
Your life must be controlled by love.
Just as Christ loved us and gave His life for us.
As a sweet-smelling offering and sacrifice.
That pleases God.